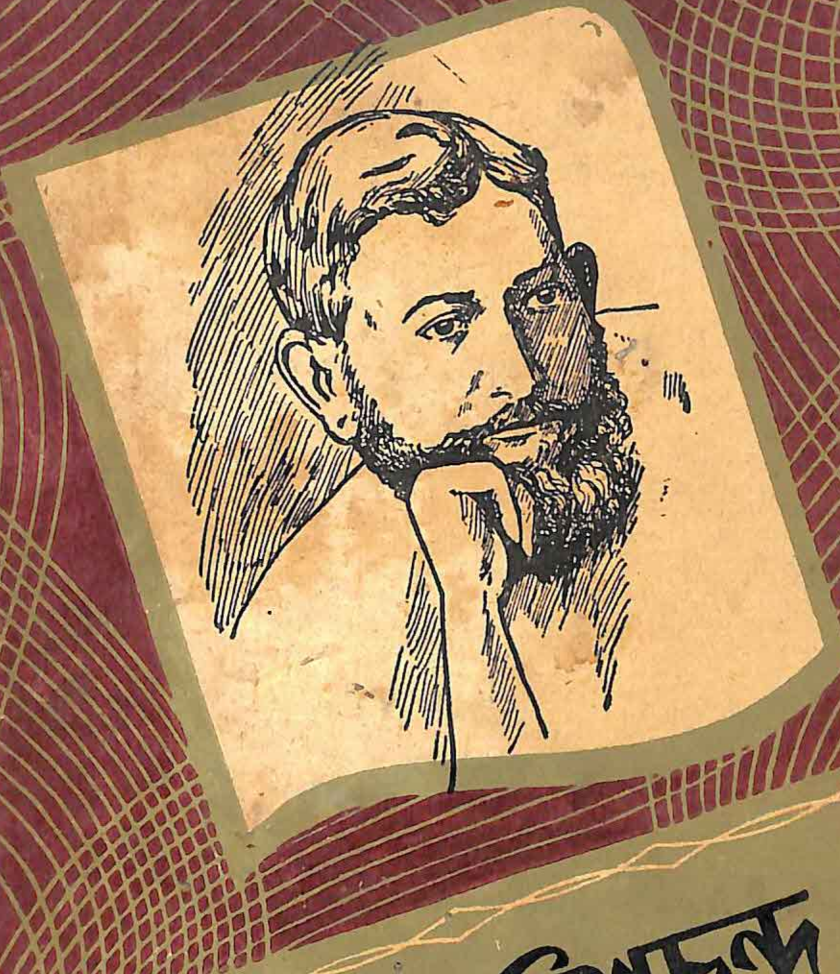


ছোটদের গিরিশচন্দ্র

মহাজীবন-গ্রন্থমালা ঃ ১৫



ছোটদের
গিরিশচন্দ্র

ঋষি দাস

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২

অঞ্চলে বাস করবার পর বসুপাড়ায় একখানি বসত-বাড়ি কেনেন এবং সেখানেই গিয়ে বাস করতে থাকেন।

রামরতনের এক ছেলের নাম নীলকমল। নীলকমল এক সওদাগরী আফিসে হিসাবরক্ষকের কাজ করতেন। তখনকার দিনে ঐসব পদ ধনে ও মানে ভালোই ছিল। নীলকমল সিমুলিয়ার বিখ্যাত বসু পরিবারে বিবাহ করেন। গোবিন্দরাম বসুর মেয়ের সঙ্গে নীলকমলের বিবাহ হয়। নীলকমলের শ্যালক নবীনকৃষ্ণ বসু সেকালের একজন বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর ডাক্তারি ছাড়বার যে কারণটি তাঁর অন্যতম ভাগিনেয়, গিরিশচন্দ্রের সহোদর অতুলকৃষ্ণ, দিয়েছেন, তা থেকে অসামান্য সততা ও বিবেকের পরিচয়ই পাওয়া যায়। এক সময়ে দু'টি রোগী তাঁর হাতে আসে। তার মধ্যে যেটি বাঁচবে ব'লে তিনি আশা করে-ছিলেন, সেটি মারা যায়; আর যেটির জীবন সম্বন্ধে তিনি আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেটিই শেষে সেরে ওঠে। চিকিৎসাবিদ্যার এই রকম অনিশ্চিত ফলাফল দেখে তিনি বললেন, এই ধরনের ব্যাবসায় টাকা রোজগার করা মহাপাপ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডাক্তারি ছেড়ে দিলেন। পরে স্যার রিচার্ড টেম্প্‌ল্ তাঁকে নাগপুরে অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার নিযুক্ত করেছিলেন।

মামার এই বিবেক ও সততা গিরিশচন্দ্রের চরিত্রে যে ছায়াপাত করবে, তাতে আর আশ্চর্য কি!

গিরিশচন্দ্রের বাবা নীলকমলের চরিত্রও যথেষ্ট উন্নত ধরনের ছিল। বিবাহের পর তাঁর এক ছেলে ও পর পর ছ'টি মেয়ে হয়। এই ছেলের নাম নৃত্যগোপাল। নীলকমলের সংসারে অভাব-অনটন বিশেষ ছিল না। কিন্তু একটি ছেলে হওয়ার পর পর-পর ছ'টি মেয়ে হওয়ায় তাঁর মনে কিছু ক্ষোভ ছিল। কিন্তু ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮-এ ফেব্রুয়ারি সোমবার তাঁর সেই ক্ষোভ দূর হ'লো। তিনি আবার এক পুত্র লাভ করলেন। জননীর অষ্টম গর্ভের সন্তান ব'লে সকলেই এই শিশুকে বিশেষ চোখে দেখতে লাগলেন। নীলকমলের বৃদ্ধ কাকা ও দাদা, এই শিশুর জন্মে এতোই উল্লসিত হলেন যে, বসুপাড়ার ঘোষ পরিবারে এক অভূতপূর্ব আনন্দ-সমারোহ দেখা দিলো। "তুমি যেদিন জন্মাও, দাদা দেশে ঢাক-ঢোল রাখেন নাই"—গিরিশচন্দ্রের "গৃহলক্ষ্মী" নাটকের এই উক্তিকে সেদিনকার অবস্থার আংশিক বর্ণনা বলা যেতে পারে। শিশুর নাম রাখা হ'লো গিরিশচন্দ্র।

গিরিশচন্দ্রের জন্মের পরই তাঁর মা অসুস্থা হলেন। মায়ের অসুস্থতার ফলে গিরিশচন্দ্র শৈশবে মাতৃস্তন্য থেকে হলেন বঞ্চিত এবং তাঁকে স্তন্যদানের জন্যে এক বাগদীর মেয়েকে বাড়িতে রাখা হ'লো। এই বাগদিনীর কোলেই শিশু গিরিশচন্দ্র বড়ো হ'তে লাগলেন। গিরিশচন্দ্র পরে তাঁর "গোবরা" নামে ছোট গল্পটিতে এই স্তন্যদায়িনীর

সুন্দর চিত্র এঁকেছিলেন। "মণি বাগদিনী বড় দজ্জাল ; কিন্তু সন্তান-প্রতিপালনে মণি সাক্ষাৎ জননীরূপ ধারণ করিয়াছে।"

গিরিশচন্দ্রের জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই কিন্তু ঘোষ পরিবারের আনন্দ-উৎসব গভীর বেদনায় ও শোকে পরিণত হ'লো। তাঁর বাবার যে কাকা ও দাদা তাঁকে এই সংসারে পরম সাদরে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন, তাঁর বয়স ছ'মাস না হ'তেই তাঁরা দুজনেই ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন। মাও অসুস্থা ; পরিবারের অপর সকলে শোকে মুহ্যমান। এই অবস্থায় শিশু গিরিশচন্দ্রের প্রতি অবহেলা ও অযত্ন হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু নীলকমল তা হ'তে দিলেন না। তিনি নিজেই তাঁর শিশুপুত্রের যত্ন ও রক্ষণা-বেক্ষণের ভার নিলেন। পিতার আদরে ও যত্নে গিরিশচন্দ্রের বয়স সাত বছর পূর্ণ হ'লো। এই সময়ে নীলকমলের সংসারে মৃত্যু আবার কঠোর আঘাত হানলো। নীলকমলের বড় ছেলে নৃত্যগোপাল অকালে মারা গেলেন। নীলকমল পুত্রশোক সামলে নিয়ে গিরিশচন্দ্রের মধ্যেই যেন তাঁর হারানো পুত্রকেও খুঁজে পেলেন। তাঁর পিতৃস্নেহ দ্বিগুণ বেড়ে গেলো। কিন্তু অন্যদিকে মায়ের কাছে গিরিশচন্দ্র যে সামান্য আদর-যত্নটুকুও পেতেন, তা বন্ধ হ'লো। মা অকারণে গিরিশের উপর অত্যন্ত কঠোর হয়ে উঠলেন। সামান্য স্নেহের জন্যেও লালায়িত হয়ে যখন বালক গিরিশচন্দ্র মার কাছে যেতেন, তখন মা তাঁকে দূর দূর

ক'রে তাড়িয়ে দিতেন। সামান্য অপরাধের জন্যেও মার কাছে তাঁর নির্যাতন চরমে উঠতো। এইভাবে একদিকে বাবার অপরিমিত ভালোবাসা ও অন্য দিকে মার কঠোর হৃদয়হীনতা বাল্যকালেই গিরিশচন্দ্রের মধ্যে এক অভূতপূর্ব মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করলো। অবাল্য দ্বন্দ্বের এই গভীর অভিজ্ঞতা একদিন তাঁকে যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হ'তে সাহায্য করেছিল, তা সহজেই বলা যায়। কেবল তাই নয়, পরে তিনি মার যে পরিচয় পেয়েছিলেন, তাতে তাঁকে মানবচরিত্র সম্পর্কে গভীরভাবে কৌতূহলী ক'রে তুলেছিল। অনুভূতির তীব্র দ্বন্দ্ব ও মানবচরিত্র সম্পর্কে গভীর ঔৎসুক্য বাল্যকালেই গিরিশচন্দ্রকে অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ও কল্পনাশীল ক'রে তুলেছিল। ভাবপ্রবণতা ও কল্পনাশীলতা ছাড়া কে কবে কবি বা স্রষ্টা হ'তে পেরেছে!

মায়ের যে অপরূপ রূপটি গিরিশচন্দ্র অকস্মাৎ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা কল্পিত কাহিনীর চেয়েও রোমাঞ্চকর। তা মাতৃচরিত্রের আশঙ্কা, সতর্কতা ও সংযমকে একটি মুহূর্তে চকিতে গিরিশচন্দ্রের সম্মুখে উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছিল। ঘটনাটি এই ঃ

একবার গিরিশচন্দ্রের কানের গোড়া ফুলে ওঠে এবং তিনি জ্বরে অচেতন হয়ে পড়েন। এই সংকটজনক অবস্থায় মা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, তিনি স্বামীকে কাতর কণ্ঠে বলতে থাকেন, "ওগো, আমার গিরেকে কোনো রকমে বাঁচাও।"

স্ত্রীর এই আকুলতায় নীলকমল নিজেও অবাক হন। বলেন, "তুমি গিরের জন্যে আজ এমন উতলা হচ্ছ কেন? তুমি তো গিরেকে কোনও দিন ভালোবাসো নি!"

স্বামীর কথায় গিরিশচন্দ্রের মা কেঁদে ফেলে বললেন, "তোমরা তো জানো না, কেমন ক'রে বুক বেঁধে ওকে আমি দূরে রেখেছি! কি জান, আমি রাক্ষসী, আমি আমার গোপালকে খেয়েছি। গিরে আমার অষ্টম গর্ভের ছেলে; আমার কুদৃষ্টিতে পাছে ওর অমঙ্গল হয়, এই ভয়ে আমি ওকে কাছে আসতে দিই নি, আমি ওকে রাতদিন অযত্ন নির্যাতন করেছি! বাছা একবিন্দু আদরের জন্যে কাছে এসেছে, আমি দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছি! সে শুধু ওরই ভালোর জন্যে। আমাকে তুমিও ভুল বুঝো না। আমার গিরেকে তোমরা বাঁচাও।"

মা ও বাবার এই কথাবার্তা সবই স্বপ্নাবিষ্টের মতো গিরিশের কানে গেল। গিরিশ সেদিন মায়ের এক অপরূপ কল্যাণময়ী মূর্তি দেখলেন।

সুচিকিৎসায় ও পিতামাতার সেবা-যত্নে গিরিশচন্দ্র সেরে উঠলেন। কিন্তু মাকে তিনি আর বেশীদিন পেলেন না। গিরিশচন্দ্রের জন্মের পর তাঁর পিতামাতার আরও চারটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল। এদের মধ্যে তিন জন ভাই, আর একজন বোন। বোনটি মৃতাবস্থাতেই জন্মেছিল। এই মৃতা কন্যা প্রসব করবার পরেই গিরিশচন্দ্রের মায়ের মৃত্যু হয়। তখন গিরিশচন্দ্রের বয়স মাত্র এগারো বছর।

দুই

শৈশবে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত ও কৈশোরের প্রারম্ভে মাতৃহীন গিরিশচন্দ্র তাঁর পিতার অবারিত স্নেহে লালিত হয়েছিলেন। ফলে তাঁর মধ্যে বাল্যকাল থেকেই দুরন্ত একগুঁয়ে ভাবটি প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল। তাঁর একগুঁয়ে আবদারগুলি কি ধরনের ছিল, একটা উদাহরণ দিলেই বেশ বোঝা যাবে। ঘোষ পরিবার অত্যন্ত ধর্মভীরু ও ভগবৎভক্ত ছিলেন। এ হেন পরিবারের কুলদেবতা শ্রীধরের নৈবেদ্যেও যখন গিরিশ ভাগ বসাতেন, তখনও তাঁর সাত খুন মাফ ছিল। একদিন গিরিশচন্দ্র খিড়কির বাগানে গিয়ে দেখলেন, শশা গাছে একটি শশায় খড় বাঁধা আছে। ফলটি গৃহদেবতা শ্রীধরের জন্যে আলাদা ক'রে রাখা হয়েছে। ঐ ফলে হাত না দিতে জ্যাঠাইমার কঠোর আদেশ আছে। কিন্তু নিষেধ করলেই গিরিশের জেদ বাড়ে। সুতরাং ঐ শশাটি খাওয়ার প্রবল বাসনা হ'লো তাঁর। বিকালে বাবা আফিস থেকে বাড়ি ফিরলে গিরিশচন্দ্র কাঁদতে লাগলেন। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "কেন কাঁদছিস রে গিরে ?" গিরে জবাব দিলেন না। কান্না সপ্তমে উঠলো। তখন নীলকমল তাঁর বউদিদিকে জিজ্ঞেস করলেন, "গিরে কাঁদে কেন বড়বউ ?"

"কি জানি ঠাকুরপো! বলে, তেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু জল দিলে খাচ্ছে না!"

এতক্ষণে গিরিশ কথা বললেন, "জল খাওয়ার তেষ্টা নয় বাবা, শশা খাওয়ার তেষ্টা।"

ছেলের এই ধরনের কথা শুনে নীলকমল হাসলেন এবং বাজার থেকে শশা কেনার ব্যবস্থা করলেন। গিরিশ প্রতিবাদ ক'রে বললেন, "বাজারের শশা নয় বাবা।"

—"তবে কোন্ শশা ?"

—"খিড়কির বাগানে যে শশাটা খড়ে বাঁধা আছে।"

শুনেই জ্যাঠাইমা তো আগুন হয়ে উঠলেন—"হতভাগা ছেলে! ঠাকুরকে দেবার জন্যে আমি শশা বেঁধে রেখেছি। সেই শশা! আর তা না খেলে তেষ্টা যাবে না তোমার! খবরদার ঠাকুরপো, তুমি কক্ষনো ওকে ঐ শশা দিতে পাবে না।"

ঠাকুর-দেবতা সম্পর্কে নীলকমলের এই ধরনের গোঁড়ামি কোনও দিন ছিল না। তিনি মৃদু হেসে বললেন, "বড়বউ, শিশু যার জন্যে এমন ক'রে কাঁদছে, সেই শশা কি ঠাকুর খেয়ে খুশী হবেন ?"

বউদিদি তাঁর ঠাকুরপোকে ভালো ক'রেই চিনতেন। "ঠাকুর-বামুন মানে না। কায়েতের ছেলে, আদর দিয়ে দিয়ে ধিঙ্গি ক'রে তুলছে"—ইত্যাদি বকতে বকতে তিনি চলে গেলেন। তারপর বাগান থেকে শশা তুলে আনা হ'লো। গিরিশচন্দ্র শশা খেয়ে তেষ্টা মেটালেন।

ধর্ম সম্পর্কে তাঁর বাবার এই উদারতা গিরিশচন্দ্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ধর্মের গোঁড়ামি তাঁকে

কোনদিন স্পর্শ করতে পারেনি। এমন কি, তা এক সময় নাস্তিকতার পর্যায়ে গিয়েও পোঁচেছিল। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম কি, তা গিরিশচন্দ্র মনে প্রাণে বুঝতেন। তাই রামকৃষ্ণও একদিন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

যাই হোক, দুরন্তপনা ও একগুঁয়েমির মধ্যেই গিরিশের বাল্যকাল কাটতে লাগলো। তখনকার দিনে কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত স্কুল ছিল গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারি। সেখানেই গিরিশচন্দ্রকে ভর্তি ক'রে দেওয়া হ'লো। কিন্তু স্কুলে তাঁর লেখাপড়া বিশেষ হ'লো না। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন প্রায়ই শিক্ষককে এমন সব প্রশ্ন করতো, যার ফলে স্কুলে তাঁর নাম বুদ্ধিমান ছাত্র হিসাবে নয়—দুষ্ট ও অবাধ্য ছাত্র হিসাবেই ছড়িয়ে পড়লো। শিক্ষকরা তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাঁর কৌতূহল মেটালেন না—তাঁকে নির্বোধ আখ্যা দিয়ে তাঁর মুখ বন্ধ করলেন। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রায়ই এমন ঘটনা দেখা যায়। যেসব ছেলে শিক্ষার বাঁধাধরা পথে এগোতে চায় না বা পারে না, তাদের প্রায়ই এই অবস্থা হয়। বিদ্যালয়ের রাজপথ তাদের জন্যে কণ্টকিত হয়ে ওঠে বা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

শুধু আমাদের দেশে নয়, ইউরোপ ও আমেরিকায় এমন ঘটনা ঘটবার অনেক নজির আছে। আমেরিকার সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসনকে একদিন তাঁর স্কুলের

শিক্ষকরা বোকা ব'লে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরে এই এডিসন সারা মার্কিন জাতির গৌরব হয়েছিলেন। তিনি এতো বেশী জিনিস আবিষ্কারের গৌরব পেয়েছিলেন, যা আর কোনও বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যে জোটে নি।

বিদ্যালয়ে গিরিশচন্দ্রের উপর শাস্তির নামে নির্যাতন হ'তো। তাই বিদ্যালয়ের শিক্ষার দিক থেকে প্রাণশক্তিতে উচ্ছল গিরিশচন্দ্রের মন খেলাধুলো ও দুরন্তপনার দিকেই ছুটলো। তাঁর বাবার অগাধ স্নেহ সেদিকে বিন্দুমাত্রও বাধার সৃষ্টি করলো না। পরবর্তী কালে প্রাপ্তবয়স্ক গিরিশচন্দ্র খেদ ক'রে নিজের শিক্ষাজীবন সম্পর্কে বলেছিলেন—"যদি তাঁহারা আমাকে তাড়না না করিয়া মিষ্ট কথায় আমি যেরূপ বুঝিতে পারি, সেইরূপ বুঝাইয়া দিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আমি শিখিতে পারিতাম।" তিনি তাঁর একাধিক নাটকেও প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে বিদ্রূপ করেছিলেন। তাঁর লেখা "কমলে কামিনী" নাটকে শিক্ষক ও ছাত্রের প্রশ্নোত্তরের একটি সুন্দর চিত্র আছে। ছাত্র শ্রীমন্ত তাঁর শিক্ষককে বলছেন—"কি বুঝালে বল আরবার।" শিক্ষক তখন চ'টে গিয়ে বলছেন—"হতচ্ছাড়া ব্যাটা, কি বুঝালেম? ব'কে ব'কে মুখে ফেকো উঠে গেল।" "নল-দময়ন্তী" নাটকেও গিরিশচন্দ্র প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অনুরূপ ইঙ্গিত দেন। ঐ নাটকে বিদূষক নিজের মূর্খতার কৈফিয়ৎ দিচ্ছে: "গুরুমশায় যে কান ম'লে দিলেন, নইলে 'ক' 'খ' শিখতুম।"

বিদ্যালয়ের শিক্ষায় গিরিশচন্দ্র বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতে না পারলেও তাঁর দেহ ও মনের বিকাশ সহজ ও স্বাভাবিক-ভাবেই হ'তে লাগলো। পরবর্তী কালে গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটক রচনা ক'রে বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করেছিলেন এবং বাংলার রঙ্গমঞ্চকে সর্বজনীন ক'রে তুলেছিলেন। সেজন্যে যে ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, তার সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর শৈশবেই। গিরিশচন্দ্রের বাবা নীলকমল বাবুর এক বৃদ্ধা কাকীমা ছিলেন। কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাসের রচনা পাঠে ও আবৃত্তিতে তাঁর জোড়া বড়ো কেউ ছিল না। তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের নানা কাহিনী এমন সুন্দরভাবে বলতে পারতেন যে, তা সজীব হয়ে উঠতো। কাহিনীর পাত্রপাত্রীরা সকলেই রক্তমাংসের মানুষ হয়ে চোখের সামনে ঘুরে বেড়াতো। রোজ সন্ধ্যাবেলা এই বৃদ্ধা ঠাকুরমার মজলিস বসতো। গিরিশচন্দ্র ছিলেন এই মজলিসের নিয়মিত সভ্য। গিরিশচন্দ্র অনেক সময় কাহিনী শুনতে শুনতে কেঁদে ফেলতেন। কেবল ঠাকুরমার মজলিসে নয়, বাড়িতে ও পাড়ায় ঐ ধরনের যেসব আলোচনা হ'তো, সেগুলিতেও গিরিশচন্দ্র নিয়মিতভাবে হাজিরা দিতেন। এখন দেশে কথকতার চল নেই। কিন্তু কথকরা ছিলেন একাধারে কাহিনীকার ও অভিনেতা। তাঁরা তাঁদের গল্পগুলিকে কেবল সুন্দর ক'রে বলতেন না, গল্পে বর্ণিত পাত্রপাত্রীদের বিভিন্ন চরিত্র এ্রাই বিভিন্ন সুরে বিভিন্ন ভঙ্গিতে অভিনয় ক'রে

দেখাতেন। কথকদের এই অসাধারণ বর্ণনা ও অভিনয়শক্তি সেদিন গিরিশচন্দ্রকে মুগ্ধ করেছিল। গিরিশচন্দ্র তাঁর পরবর্তী জীবনে সেই সময়কার বাংলা রঙ্গমঞ্চের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা-রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। সুনিপুণ অভিনয়ের প্রথম পাঠ সম্ভবত গিরিশচন্দ্র এই কথকদের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। তাই বড় হয়েও পুরাণ ও কথকতার নিন্দা তিনি সইতে পারতেন না। কেউ পুরাণের নিন্দা করলে তিনি বলতেন, "তুমি কি বলছ, তুমি নিজেই তা জান না।" নিজেও তিনি অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে কথকতা করতেন। শিক্ষিত লোকরা ঐ সময়ে কথকতার ওপর শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন। তাঁরা রঙ্গমঞ্চের অভিনয়কেই উচ্চতর পর্যায়ের শিল্প মনে করতেন। একবার এক শিক্ষিত লোক গিরিশচন্দ্রের কাছে কথকতা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করলে পরদিন তিনি নিজেই কথকতা ক'রে তাঁকে ও অন্যান্য বন্ধুদের "ধ্রুবচরিত" শোনান। সকলেই অবাক হয়ে যান। কথকরা যে অসাধারণ অভিনয় শক্তির অধিকারী—তা তাঁরা স্বীকার ক'রে নেন। তাঁর জীবনে বাল্যকালের এই পুরাণ কাহিনী ও কথকতা শোনা যে কী প্রভাব বিস্তার করেছিল, গিরিশচন্দ্র নিজেই তার বর্ণনা দিয়েছেন : "বুড়ীর (বৃদ্ধা ঠাকুরমার) গল্পে আমার মনে এমন গভীর বেদনার উদয় হয়েছিল যে, এখনও মনে হ'লে আমার মনে গভীর দুঃখ হয়। আমি মাথুর-লীলা এখনও পড়তে পারি না। ছেলেবেলা এই পুরাণপ্রসঙ্গ আর বড় হয়ে

দিগম্বর কথকের কথকতা শুনে পৌরাণিক নাটক লেখা আমার এমন সহজসাধ্য হয়েছিল।”

গিরিশচন্দ্র স্কুলের পর স্কুল বদলাতে লাগলেন। শিক্ষা-লাভ বিশেষ হ’লো না। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষাই তো জীবনের সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা নয়—সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা হ’লো জীবন-যুদ্ধের শিক্ষা। কৈশোর পার না হ’তেই তাঁর সে শিক্ষা শুরু হয়ে গেল।

স্ত্রী মরবার অল্পদিন বাদেই বাবা নীলকমলের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লো। তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েই আফিসে যাতায়াত করতে লাগলেন। অনেকদিন ধরে তিনি আমাশা রোগে ভুগছিলেন। এখন সেই রোগ আবার বাড়লো। চিকিৎসকরা বিশ্রামের পরামর্শ দিলেন। নীলকমল বিশ্রাম নিলেন, কিন্তু রোগ সারলো না। এর অল্পদিন বাদেই তাঁর মৃত্যু হ’লো। গিরিশচন্দ্র সেই সবে চৌদ্দ বছরে পা দিয়েছেন। যে পিতার নিরাপদ আশ্রয়ে গিরিশচন্দ্র এতোদিন দুরন্তপনায় অতিবাহিত করেছিলেন, তা অকস্মাৎ সরে যাওয়ায় গিরিশচন্দ্র দেখলেন, সারা সংসারের দায়িত্ব তাঁর একার ওপর—পিতৃমাতৃহীন তিনটি ছোট ভাই তাঁরই মুখ চেয়ে রয়েছে!

তিন

নীলকমল ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি। নাবালক ছেলেদের তিনি স্রোতের মুখে অসহায় তৃণের মতো ভাসিয়ে দিয়ে যান নি। তিনি বিষয়-সম্পত্তি কিছু রেখে গিয়েছিলেন, তা ঠিকমতো চালানো হ'লে ছেলেদের মানুষ হওয়ার পথে যে বাধা হবে না, তা তিনি জানতেন। তবে তেরো-চোদ্দ বছরের বালক গিরে যে সে বিষয়ে উপযুক্ত পাত্র, এরকম কোনও ভুল ধারণা তাঁর ছিল না। তাই তিনি অন্য ব্যবস্থা করলেন। তাঁর বড় মেয়ে ছিলেন বিধবা। তাঁর বুদ্ধি ও ভ্রাতৃ-স্নেহ, দুটিই ছিল প্রবল। নীলকমল মরবার আগে তাঁকেই নাবালক ছেলেদের অছি নিযুক্ত ক'রে গেলেন। গিরিশচন্দ্র নিজে বলেন ঃ "বাবা এমনি বিচক্ষণ ছিলেন যে, মৃত্যুর পূর্বে আমাদের বিষয়-আশয় সম্পর্কে যা কিছু বিপদাশঙ্কা আছে, যা কিছু করতে হবে, একখানি খাতায় সব এমনি লিখে রেখে গেছলেন, যাতে স্ত্রীলোক বালকেও তা দেখে বিষয় রক্ষা করতে পারে।"

যে-বৎসর গিরিশচন্দ্রের বাবা মারা যান, সেই বছর ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহের আগুন বারাকপুর থেকে দিল্লী, মিরাট, কানপুর, লখ্‌নৌ, অযোধ্যা, সারা উত্তর ভারতে লেলিহান শিখার মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। পরে গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন ঃ "সে ভয়ংকর

দিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। বাহিরে যেমন বিভীষিকা, আমার অন্তরেও তেমনি বিভীষিকা। এই বিভীষিকা নিয়ে সংসারে আমার প্রথম প্রবেশ।"

দিদির সুপরিচালনায় গিরিশচন্দ্রের কৈশোর নির্ঝঞ্ঝাটেই কাটতে লাগলো। গিরিশচন্দ্র পরবর্তী কালে বলেন, "বাবা মারা যেতে আমার প্রথম ভাবনা হয়েছিল ভাইগুলিকে মানুষ করব কেমন ক'রে ; তাই দিদিকে বলেছিলুম, বিকেলে আর জলখাবার ক'রো না, আমাদের দুটি দুটি মুড়ি দিও। কিন্তু বাবা মোটা ভাত মোটা কাপড়ের যোগাড় ক'রে রেখে গিয়েছিলেন। নইলে কি সখ ক'রে মেতে বেড়াতে পারতুম ?"

প্রকৃতপক্ষে এ রকম কোনও ব্যয়সংকোচের প্রয়োজন হয় নি। দিদি বরং গিরিশের বিয়ের ব্যবস্থাও করলেন। বাবা মরবার পরের বছর কলিকাতার শ্যামপুকুরের নবীনচন্দ্র দেবের একমাত্র কন্যার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের বিয়ে হ'লো। বিয়ের দিন একটি ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটেছিল। বিয়ে বাড়িতে আনন্দ উৎসব চলছে, এমন সময় হঠাৎ খবর এলো নিমতলার কাঠের গুদামে আগুন লেগেছে। দক্ষিণের হাওয়ায় লেলিহান অগ্নিশিখা দ্রুত ঈশান কোণের দিকে ছড়িয়ে পড়লো। অগ্নির সে তাণ্ডব-নৃত্যে আমোদ-প্রমোদ চুলোয় গেলো, যে যার ঘর-দোর রক্ষার জন্যে চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগলো। আগুন ক্রমেই বাগবাজারের পল্লী পর্যন্ত এগিয়ে এলো। গিরিশচন্দ্রের বাড়ির পশ্চিম দিকে একটি তেঁতুল গাছ ছিল,

সেই গাছ দাউ দাউ ক'রে পুড়ে গেল। গিরিশচন্দ্রের সৌভাগ্য যে, আগুন সেদিন আর বেশী পুবে এগোয় নি। নইলে গিরিশচন্দ্রকে সেদিন গৃহহীন হ'তে হ'তো। এইভাবে বাল্য-কালেই বারে-বারে মৃত্যু ও বিপদ্ এসে তাঁকে আঘাত দিতে লাগলো। জীবনকে যেন মৃত্যু ও বিপদের মধ্য দিয়েই ক্ষণে ক্ষণে তিনি চিনতে লাগলেন।

বাবা মরবার পর শাসন ও তিরস্কারের শেষ সম্ভাবনাটুকুও ঘুচে গেল। তখন গিরিশচন্দ্র যে পথে পা বাড়ালেন, তাতে "ভাইগুলিকে মানুষ করব কেমন ক'রে" এ কথা মাথায় থাকার কথা নয়। পাড়ার যতো বাউণ্ডুলে ছেলে তাঁর সঙ্গী হয়ে উঠলো; তাদের সঙ্গই তাঁর একমাত্র আনন্দ ও ব্যস্ততা হয়ে দেখা দিলো। আঠরো বছর বয়সে সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধে ও উপদেশে গিরিশচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন। কিন্তু পরীক্ষায় কৃতকার্য হ'তে পারলেন না এবং বিদ্যালয়ের পথ চিরদিনের মতো ত্যাগ করলেন। এখন তিনি নিয়মিতভাবে বাউণ্ডুলে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন; যাত্রা, হাফ-আখড়াই, কথকতা, তরজা, পাঁচালী, কবির-লড়াই কোথাও হচ্ছে শুনলে রীতিমতো সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। কৈশোরেই গিরিশচন্দ্র সুগঠিত ও সুকান্তি দীর্ঘদেহের অধিকারী ছিলেন, তাঁর কণ্ঠস্বরও সুমধুর ছিল। তাই বিদ্যালয়ের দোর যখন বন্ধ হ'লো, তখন যাত্রা, কবি, তরজা, হাফ-আখড়াই, পাঁচালী,

কথকতা, কি ঐ ধরনের কিছুতে ভিড়ে পড়বার কথাও তিনি ভাবতে লাগলেন। বাউণ্ডুলে বন্ধুদের সঙ্গে মেশায় তাঁর অনেক চারিত্রিক দোষও দেখা দিলো। তবে দল বেঁধে দুঃস্থের সেবা ও উপকার করার একটি মহৎ বৃত্তিও তাঁর মধ্যে যথেষ্টরূপে বিকাশ পেলো। কোথায় কলেরা-বসন্ত হয়েছে, কোথায় কাদের রোগীর পথ্য জুটছে না, কোথায় কার মুখে দু'দিন অন্ন নেই, কোথায় কোন্ পরিবারের মড়া শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার লোক জুটছে না—সকল খবরই গিরিশচন্দ্রের কাছে আসতো এবং তার প্রতিকারের জন্যে গিরিশচন্দ্র সদলবলে গিয়ে উপস্থিত হতেন। ঐ সময় পাড়ায় প্রায়ই একদল দুষ্ট সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হ'তো। তারা দুপুরে পুরুষরা যে যার কর্মস্থলে চলে গেলে বাড়িতে এসে উপস্থিত হ'তো এবং বাড়ির মেয়েদের কাছ থেকে নানারকম অমঙ্গলের ভয় দেখিয়ে টাকা-পয়সা আদায় করতো। গিরিশচন্দ্র অল্পকালের মধ্যেই এইসব দুষ্ট সন্ন্যাসীকে নানাভাবে লাঞ্ছনা ক'রে সায়েস্তা করলেন। গিরিশ আছেন জানলে, ঐ ধরনের লোক পাড়ার ত্রিসীমানায় আসতো না। এইসব কাজের জন্যে পাড়ার অনেকে গিরিশচন্দ্রকে মনে মনে ভালোও বাসতেন। তবে ঠাকুর-দেবতা মানে না, দেব-দ্বিজে ভক্তি করে না, অসৎসঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, মদ-ভাঙ খেয়ে উচ্ছন্নে যাচ্ছে—ইত্যাদি কারণে অনেকে তাঁকে ভয় ও ঘৃণাও করতেন।

গিরিশচন্দ্রকে অনেকে বোকাও মনে করতেন। একবার

বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে এক মামলা হ'লো। গিরিশচন্দ্র তাতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে শেখানো মিছে কথার বদলে সত্যিকথা ব'লে এলেন। সেজন্যে আত্মীয়-স্বজনের কাছে তাঁকে নানাভাবে তিরস্কৃত ও অপমানিত হ'তে হ'লো—তিনি যে অতিশয় নির্বোধ, তা শীঘ্রই প্রচারিত হয়ে গেল। সাধুতা ও সারল্যের জন্যে তিনি কৈশোরে যেভাবে ঘরে-বাইরে তিরস্কৃত হয়েছিলেন, তার স্মৃতি তাঁর পরবর্তী জীবনেও স্থায়ী হয়েছিল। এই স্মৃতিই যেন তাঁর "মায়াবসান" নাটকে কালীকিঙ্করের মুখে প্রকাশ পেয়েছে—"উন্মাদ! উন্মাদ! উন্মাদ ভিন্ন এ সংসারে সত্য কে বলতে চায়! মিথ্যা সাক্ষী দিতে কে নারাজ হয়! ব'য়ে লেখা আছে, সত্য কথা বলতে হয়, সত্যকথা বলতে হয়; ছেলেদের শেখাতে হয়, সত্যকথা বলতে হয়; বড় হ'লে সত্যকথা বলতে নেই, বিষয়-কর্মে সত্যকথা বলতে নেই; পাগলে বলে, পাগলে বলে—বুঝলে?"

যাই হোক। এই অভিভাবকহীন অস্থির জীবনই যে একদিন গিরিশচন্দ্রকে রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যের দিকে টেনে এনেছিল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। তাই গিরিশচন্দ্রের এই কথাগুলি একান্তই সত্য :

"কর্মক্ষেত্রে যাকে যে কাজ করতে হবে, যার যেমন শিক্ষার প্রয়োজন, ভগবান তাকে তেমনই শিখিয়ে পড়িয়ে নেন। চোদ্দ বছর বয়সে আমার বাবা মরে গিয়েছিল। তা

না হ'লে সংসারে স্বাধীনভাবে বেড়াতে পারতুম না। যাত্রা-থিয়েটারের দলেও মিশতে পারতুম না। মাথার উপরে কেউ ছিল না ব'লে আমাকে সর্বদাই লোক চিনে চলতে হ'তো।"

তাঁর কৈশোরের অপর একটি ঘটনাও তাঁর জীবনের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। তখন গিরিশচন্দ্রের বয়স বছর চোদ্দ হবে। তখন তিনি কবি ঈশ্বর গুপ্তের সম্মান দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর বালক হৃদয়ের গোপন গভীরে ঈশ্বর গুপ্তের মতো হওয়ার একটি বাসনা বাসা বেঁধেছিল। ঐ দিনের ঘটনা সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র বলেন ঃ

"পাড়ায় ভগবতী গাঙ্গুলিদের বাড়িতে একদিন হাফ্-আখড়াই শুনতে যাই, গিয়ে দেখি এত ভিড় যে বড় বড় লোক সব কল্‌কে পাচ্ছেন না—আমাদের কে আমল দেয়! এমন সময় সামান্য কাপড়-চোপড় পরে একটি লোক এল, আর অমনি সভার সব বড় বড় লোক তাঁকে আপ্যায়িত করবার জন্য ছুটে গেল। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম লোকটা কে? শুনলুম, ঈশ্বর গুপ্ত—হাফ্-আখড়ার হয়ে গান বাঁধতে এসেছেন। সমস্ত লোক যেন তাঁকে এক সঙ্গে অভ্যর্থনা করলো।"

কবির আদর দেখে এবং যাত্রা, হাফ্-আখড়াই প্রভৃতির প্রতি সহজ প্রীতি থাকায় গিরিশ মনে মনে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন এবং একলব্যের মতো সাধনা করবার জন্যে

ঈশ্বর গুপ্তের বিখ্যাত পত্রিকা "সংবাদ প্রভাকরের" গ্রাহক হলেন। তখনও বাংলা সাহিত্য ক্ষীণতোয়া তটিনীর মতো মৃদুতরঙ্গে প্রবাহিত হচ্ছিল। তখন বঙ্কিম-চন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন বা দীনবন্ধুর সাহিত্যিক আবির্ভাব হয়নি। ঐ সময়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বেতাল-পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি কতকগুলি বই খুবই জনপ্রিয় ছিল। গিরিশচন্দ্র সেগুলি মনোযোগের সঙ্গে পড়লেন। কাশীরাম দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ ও মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কবিকঙ্কণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় বাল্যকাল থেকেই ছিল। ঐ সকল শ্রেষ্ঠ রচনা প'ড়ে তিনি প্রায় মুখস্থ ক'রে ফেললেন। ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের রচনাগুলিও বাদ গেল না। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করবার জন্যেও তাঁর চেষ্টা চলতে লাগলো।

কবি হওয়ার লোভে গিরিশচন্দ্র পড়াশুনোয় মন দিলেন। কিন্তু পড়াশুনো করলেও তাঁর জীবনের বাউণ্ডুলে ভাব গেল না, চরিত্রের স্খলনও রোধ হ'লো না। কৈশোর পার হয়ে তিনি যৌবনে পা দিলে এই স্খলন আরও দ্রুত হয়ে উঠলো। এর পরিণতি ভেবে তাঁর আত্মীয়স্বজন সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সকলেই স্থির করলেন, এখন গিরিশচন্দ্রকে কোনও কাজে নিযুক্ত ক'রে দিতে না পারলে তাঁর এই পতন রোধ করা যাবে না। গিরিশচন্দ্রের শ্বশুর নবীনবাবু জন এটকিন্‌সন কোম্পানির হিসাবরক্ষক ছিলেন। তিনি

গিরিশচন্দ্রকে নিজের আফিসে শিক্ষানবীশ হিসেবে ভর্তি ক'রে নিলেন।

এতে গিরিশচন্দ্রের দুরন্ত যৌবন ও দুর্বার প্রাণশক্তি কিছুটা বাধা পেলো। এটকিন্‌সন কোম্পানির আফিসে শিক্ষানবীশী শেষ ক'রে তিনি আর্জেন্টি সিলিজ কোম্পানির আফিসে সহকারী কেশিয়ারের পদে নিযুক্ত হলেন। সেখানে কিছুদিন কাজ করবার পর তিনি আবার জন এটকিন্‌সন কোম্পানিতে ফিরে এলেন। এখন পেলেন সহকারী হিসাব-রক্ষকের কাজ।

উচ্ছৃঙ্খল বাউণ্ডুলে ভাবটা গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের একটি দিক হ'লেও এর একটি সম্পূর্ণ বিপরীত দিকও তাঁর চরিত্রের মধ্যে ছিল। এমন অসামান্য দায়িত্ববোধ ও কর্মনিষ্ঠা সচরাচর দেখা যায় না। তিনি এটকিন্‌সন কোম্পানির আফিস থেকে একদিন বাড়ি ফিরছেন, এমন সময় পথে আকাশের পানে তাকিয়ে দেখলেন, পশ্চিম আকাশে মেঘ জমেছে। এটকিন্‌সন কোম্পানির ছিল নীলের কারবার। তাঁর মনে পড়ল, ঐ দিন আফিসের ছাদে নীল শুকোতে দেওয়া হয়েছে। নীল যদি ভেজে, তবে কোম্পানির প্রায় হাজার টাকা জলে যাবে। গিরিশ বাড়ি ফিরলেন না, তাড়াতাড়ি গেলেন আফিসে। আফিস ছুটি হয়ে গিয়েছিল, তাই কুলী ডাকিয়ে নিজেই নীল গুদামজাত করলেন। তিনি যখন ঐ কাজে ব্যস্ত, তখন নিজে এটকিন্‌সন সাহেব এসে হাজির।

গিরিশচন্দ্রের দায়িত্ববোধ ও কর্মনিষ্ঠা দেখে এটকিন্সন কেবল খুশী নয়, বিস্মিতও হলেন। পরদিন কিন্তু আফিসের ছোট সাহেবের সঙ্গে এ নিয়ে বিরোধ বাধলো, তিনি কুলী খরচ মঞ্জুর করবেন না। তখন গিরিশচন্দ্র বড় সাহেব এটকিন্সনের কাছে গিয়ে তাঁর সমুখেই বিল হাজির করলেন। এটকিন্সন তখনি বিল মঞ্জুর ক'রে দিয়ে হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে লোহার সিন্দুক খুললেন। বললেন, "গ্রীস, রুমাল বার কর, এর ভেতর থেকে তিন আঁজলা টাকা তুলে নাও।"

গিরিশচন্দ্রের ওপর এটকিন্সন খুবই খুশী হয়েছিলেন।

গিরিশচন্দ্র নিয়মিতভাবে আফিস করতে লাগলেন। কিন্তু আফিসের বাইরে বাকী সময়টা ছিল তাঁর অত্যন্ত অনিয়মিত। সেটাকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়— উচ্ছৃঙ্খলতা আর পড়াশুনো। এই সময় গিরিশচন্দ্র তাঁর মামা নবীনকৃষ্ণ বসুর (যিনি ডাক্তারি ছেড়ে দিয়েছিলেন) উৎসাহে ও পরামর্শে নানা ইংরেজী বই পড়লেন। গিরিশচন্দ্রের প্রতিবেশী ও বাল্যবন্ধু ছিলেন ব্রজবিহারী সোম। তিনি পরে সাবজজ হয়েছিলেন। তিনিও গিরিশচন্দ্রকে পড়াশুনোয় উৎসাহ দিতে ও সাহায্য করতে লাগলেন।

এইভাবে গিরিশচন্দ্রের এক মহাজীবনের জন্যে প্রস্তুতি চলতে লাগলো।

চার

অভিনেতা ও নাট্যকার রূপেই গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার পুরোপুরি বিকাশ ঘটেছিল। গিরিশচন্দ্র যখন ঐ দুই শিল্পের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন এই দুই শিল্পের অবস্থা কেমন ছিল, তা না জানলে তাঁর কৃতিত্ব কী অসামান্য ছিল, তা অনুমান করা যাবে না। গিরিশচন্দ্র যখন এ পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, বাংলা নাট্যশিল্পের রাজপথ তখনও তৈরী হয়নি। সেই সবেমাত্র তার সূত্রপাত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার অসামান্যতা ঠিকমতো বুঝবার জন্যে তখনকার রঙ্গালয় ও নাট্যসাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার।

বাংলা নাট্যশালার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ২৫ নং ডুমতলা বা ডোমটোলীতে (এখনকার এজরা স্ট্রীটে)। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হেরাসিম লেভেদেফ নামে একজন রাশিয়ান। তিনি দুখানা ইংরেজী নাটক বাংলাভাষায় অনুবাদ ক'রে বাঙ্গালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দিয়ে এই থিয়েটারে অভিনয় করান। কয়েক বছর বাদে লেভেদেফ সাহেব ইংলণ্ডে চ'লে গেলে সেই সঙ্গে এই থিয়েটারও লোপ পায়। এর

পর সুদীর্ঘ চল্লিশটি বছর কেটে যায়। নাট্যাভিনয় সম্পর্কে বাঙ্গালীর আর উৎসাহ বা চেতনা দেখা যায় না। যাত্রা, পাঁচালী, কবি, হাফ-আখড়াই ইত্যাদি দিয়েই বাঙ্গালী জনসাধারণ মনের খোরাক মেটাতে থাকে। তবে এ-গুলিতে প্রায়ই এমন কুরুচির প্রকাশ ঘটতো যে, এগুলি শিক্ষিত সমাজে নিন্দনীয় ব'লেই গণ্য হ'তো। একদল শিক্ষিত লোক যাত্রাভিনয়কে সুরুচিসম্মত ক'রে তোলার চেষ্টা করেন। ১৮৪৯ সালের মার্চ মাসে "নন্দবিদায় যাত্রা" নামে নূতন ধরনের একটি যাত্রার দল আত্মপ্রকাশ করে। এই যাত্রার দলের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, এতে মেয়েরাও অভিনয় করতেন। কিন্তু নাটক বলতে এখন আমরা যা বুঝি, সেই ইউরোপীয় প্রভাবে ও রীতিতে রচিত নাটকের কিছুই ছিল না এতে।

লেভেদেফ সাহেব এদেশের বাঙ্গালী সমাজে ইউরোপীয় প্রথায় যে নাটক ও নাটকাভিনয় প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, তা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি— লোকে সে কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর নারিকেলডাঙ্গার বাগান বাড়িতে হিন্দু থিয়েটার নামে একটি নাট্যশালার উদ্‌বোধন করেন। সেখানে মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়রের "জুলিয়াস সীজার" নাটকের কিছু অংশ এবং মহাকবি ভবভূতির উত্তররামচরিতের ইংরেজী অনুবাদ অভিনীত হয়। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় অভিনয়

হওয়ায় সেগুলি জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে নি। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই এই নাট্যশালাটি উঠে যায়।

এর চার বছর বাদে ১৮৩৫ সালে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু তাঁর নিজের বাড়িতে একটি নাট্যশালা স্থাপন করেন। ঐ নাট্যশালায় বছরে চার-পাঁচ বার বাংলা নাটকের অভিনয় হ'তো। এখানে বিখ্যাত বাংলা উপাখ্যান "বিদ্যাসুন্দরকে" নাটকে রূপান্তরিত ক'রে অভিনয় করানো হয়। এই নাটকে স্ত্রী-ভূমিকায় মেয়েরা অভিনয় করেছিলেন। কিছুদিন চলবার পর এই নাট্যশালাটিও লোপ পায়।

ঐ সময় বাঙ্গালীর জীবনে নানা দিক থেকে পরিবর্তন এসেছিল। নাটক ও অভিনয়ের প্রতি ক্রমবর্ধমান প্রীতিও সেগুলির একটি। তাই প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও নবীনচন্দ্র বসু পরিচালিত নাট্যশালাগুলি লোপ পেলেও বাঙ্গালীর অভিনয়-প্রীতি গেল না। কেবল তাই নয়, ঐ সময় অনেকে খুবই উচ্চস্তরের অভিনয় কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। ঐ সময় কলকাতায় যেসব ইংরেজ-পরিচালিত ইংরেজী নাট্যশালা ছিল, তাতে বাঙ্গালীরা গিয়েও অভিনয় করতেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২-এ আগষ্ট তারিখের "সংবাদপ্রভাকর" কাগজে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। তা থেকে জানা যায়, ঐ সময় সাঁ সুসি থিয়েটারে শেক্‌স্‌পীয়রের বিখ্যাত "ওথেলো" নাটকখানি অভিনীত হয়েছিল। তাতে বৈষ্ণবচন্দ্র আঢ্য

নামে একজন বাঙ্গালী ইংরেজীতে ওথেলোর অভিনয় ক'রে ইংরেজদেরও চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যেও অভিনয় প্রীতিটি বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট তারিখে বটতলায় ডেভিড হেয়ার একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ একাডেমির ছাত্ররা ১৮৫৩ সালে শেক্স্পীয়রের বিখ্যাত নাটক "মার্চেণ্ট অব ভেনিস" অভিনয় করেন। সমসাময়িক সংবাদপত্রে ঐ অভিনয়ের খুবই প্রশংসা করা হয়েছিল। প্রায় ছ'-সাত শ' দর্শক ঐ অভিনয় দেখেছিলেন। তাতে অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ দর্শকও উপস্থিত ছিলেন। ঐ সময়কার বিখ্যাত স্কুল ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিও ডেভিড হেয়ার একাডেমির অনুসরণে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার নামে একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন। তাঁরা ডেভিড হেয়ার একা-ডেমিতে "মার্চেণ্ট অব ভেনিস" অভিনীত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই শেক্স্পীয়রের বিখ্যাত নাটক "ওথেলো" অভিনয় করেন। পর বৎসর (১৮৫৪) এখানে "মার্চেণ্ট অব ভেনিস" নাটকখানিও অভিনীত হয়। দ্বিতীয় বার অভিনয়কালে মিসেস গ্রিস নামে একজন ইংরেজ মহিলা পোর্শিয়ার ভূমিকায় নেমেছিলেন। পর বৎসর এখানে শেক্স্পীয়রের "চতুর্থ হেনরি" নাটক এবং মেরেডিথ পার্কারের "আমাটোর" নামে প্রহসন অভিনীত হয়েছিল।

কেবল স্কুল-কলেজে নয়, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পারিবারিক

নাট্যশালাতেও ঐ সময় ইংরেজী নাটকের অভিনয় হ'তে থাকে। শ্যামবাজারের যে নবীনচন্দ্র বসু নিজের বাড়িতে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন ক'রে "বিদ্যাসুন্দর" অভিনয় করিয়েছিলেন, তাঁর ভাইপো প্যারীমোহন বসুর বাড়ি ছিল জোড়াসাঁকোয়। জোড়াসাঁকোর ঐ বাড়িতে প্যারীমোহন একটি নাট্যশালা স্থাপন করেন। তাতে ১৮৫৪ সালের মে মাসে শেক্‌স্‌পীয়রের বিখ্যাত নাটক "জুলিয়াস সীজার" অভিনীত হয়।

কিন্তু এখন যে নাট্যাভিনয়গুলির কথা বললাম, তাতে ইংরেজী নাটকেরই অভিনয় হচ্ছিল—বিশেষত শেক্‌স্‌পীয়র-রচিত সুবিখ্যাত নাটকগুলির। এইসব অভিনয়ের ফলে শিক্ষিত বাঙ্গালীদের একাংশ ইউরোপীয় নাটকের ধারায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিলেন সত্য; তবে এগুলিকে প্রকৃত পক্ষে বঙ্গীয় নাট্যশালা বলা চলে না। তাই ঐ সময় বাঙ্গালীর মধ্যে বাংলাভাষায় নাটক রচনা ও রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের অভিনয় সম্পর্কে দাবী ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এ বিষয়ে ঐ সময়কার অন্যতম বিখ্যাত কাগজ "হিন্দু পেট্রিয়ট" বাঙ্গালী নাট্যামোদীদের সচেতন ক'রে তুলেছিলেন।

১৮৫৭ সালটি সিপাহী বিদ্রোহের জন্য ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। বাংলা নাটকের ইতিহাসেও ঐ সালটি খুবই উল্লেখযোগ্য। কারণ, দীর্ঘকাল পরে ঐ বছরই আবার বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজ বাংলা নাটক অভিনয়ের দিকে মন

দেন। ঐ সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গীয় নাট্যশালা ও সাহিত্যের ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ শুরু হয়।

কলিকাতার বিখ্যাত ধনী আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্রদের উদ্যোগে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে আশুতোষ দেবের বাড়িতে নন্দকুমার রায়ের লেখা বাংলা নাটক অভিজ্ঞান-শকুন্তলার প্রথম অভিনয় হয়। শকুন্তলার ভূমিকায় নেমেছিলেন ছাতুবাবুর অন্যতম দৌহিত্র শরৎকুমার ঘোষ। তিনি প্রায় বিশ হাজার টাকার গহনা প'রে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন। তখনকার দিনের অভিনয়ের এ-ও ছিল একটা বৈশিষ্ট্য।

ছাতুবাবুর দৌহিত্রদের অনুসরণে কলিকাতার অন্যান্য ধনী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও অনেকে নিজ নিজ বাড়িতে নাট্যশালা গ'ড়ে তোলেন এবং বাংলা নাটকের অভিনয় করতে শুরু করেন। ছাতুবাবুর বাড়িতে শকুন্তলা অভিনয়ের অল্পদিন বাদেই নূতন বাজারে রামজয় বসাকের বাড়িতে "কুলীনকুলসর্বস্ব" নামে একটি বাংলা নাটকের অভিনয় হয়। এইটিই বাংলা ভাষায় প্রথম সামাজিক নাটক। এর রচয়িতা ছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। আবার এই নাটকের অভিনয় হয় বড়বাজারে গদাধর শেঠের বাড়িতে। ঐ অভিনয়ে দর্শক হিসাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও উপস্থিত ছিলেন।

সে সময়ের বিখ্যাত লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়িতে বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামে একটি সাহিত্য-সভা ছিল। ঐ

সভার পক্ষ থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহের উৎসাহে একটি রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয়। তাতে ১৮৫৭ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখে ভট্টনারায়ণ-রচিত সংস্কৃত নাটক "বেণীসংহারের" বাংলা অনুবাদ "বেণীসংহার" মঞ্চস্থ করা হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজেও এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন। এই নাটকের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি নিজে কালিদাসের "বিক্রমোর্বশী" বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। নভেম্বর মাসে "বিক্রমোর্বশী" নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হয়।

কিন্তু পরের বছর বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে। সেটি হ'লো বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁর ভাই ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উদ্‌যোগে তাঁদেরই বাগানবাড়িতে এই নাট্যশালা স্থাপিত হয়েছিল। বেলগাছিয়ার এই নাট্যশালায় সাজসজ্জা ও দৃশ্যপটের জন্যে বহু টাকা খরচ হয়েছিল। এখানেই প্রথম দেশীয় ঐকতান দলের প্রবর্তন হয়। বাংলা "রত্নাবলী" নাটক দিয়ে এই নাট্যশালার উদ্‌বোধন হয়েছিল (৩১-এ জুলাই, ১৮৫৮)। শ্রীহর্ষের "রত্নাবলী" নামে বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক অবলম্বনে রামনারায়ণ তর্করত্ন এই নাটকখানি রচনা করেছিলেন। কেবল "রত্নাবলী" নাটকের জন্তই দশ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। রত্নাবলীর অভিনয়ে কলকাতার সকল দেশী বিদেশী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। তখনকার লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্নর

স্যার ফ্রেডেরিক হ্যালিডেও সপরিবারে এই অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। সেজন্যও বেলগাছিয়া নাট্যশালার নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। ১৮৫৬ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে কলকাতার পুলিশ কোর্টে কাজ করছিলেন। কলকাতার লোকে তখনও তাঁকে চিনতো না। নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ তাঁকে দিয়ে ইংরেজ দর্শকদের জন্যে "রত্নাবলী" ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়ে নেন। এজন্যে তাঁকে পাঁচ শ' টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। কিন্তু সেইটিই বড় কথা নয়। বেলগাছিয়া নাট্যশালার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে মাইকেল নিজেও নাটক রচনার কাজে মন দেন। শীঘ্রই তিনি লেখেন তাঁর বিখ্যাত নাটক "শর্মিষ্ঠা"। পরের বছর (১৮৫৯) সেপ্টেম্বর মাসে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মহাসমারোহে "শর্মিষ্ঠা" নাটকের অভিনয় হ'লো। এইভাবে বাংলা নাটকে এক মহাপ্রতিভার করস্পর্শ ঘটলো। অবশ্য, মাইকেল তখনো মহাকবি ব'লে পরিচিত হন নি।

"শর্মিষ্ঠা" অভিনয়ের পর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় আর কোনও নাটকের অভিনয় হয়নি। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকালমৃত্যু হয়। ফলে বেলগাছিয়া নাট্যশালা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

এর কাছাকাছি সময়েই কলকাতার আরও কয়েকজন

সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির উদ্‌যোগে ও বাড়িতে কয়েকটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হয়।

সেগুলির মধ্যে বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের (পরে মহারাজা) বাড়িতে স্থাপিত পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়, শোভাবাজারের রাজবাড়িতে স্থাপিত প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে স্থাপিত জোড়াসাঁকো থিয়েটার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়িতে ১৮৫৯ সালে কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটক অবলম্বনে লেখা বাবু যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের "মালবিকাগ্নিমিত্র" অভিনীত হয়েছিল। পরে তাঁর ও তাঁর ছোট ভাই সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চেষ্টায় পাথুরিয়ঘাটা বঙ্গ রঙ্গালয় স্থাপিত হয়। "বিদ্যাসুন্দর" নাটক দিয়েই পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়ের উদ্‌বোধন হয়েছিল (১৮৬৫)। ঐ সঙ্গে "যেমন কর্ম তেমনি ফল" নামে একটি প্রহসনও অভিনীত হয়েছিল। এই দুটি নাটক ও প্রহসন আট-ন'বার অভিনীত হওয়ার পর "বুঝলে কিনা" নামে একটি প্রহসন মঞ্চস্থ করা হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্ত-রচিত প্রহসন "একেই কি বলে সভ্যতা" দিয়ে শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটির উদ্বোধন হয়। ১৮৬৭ সালে এখানেই প্রথম মঞ্চস্থ হয় মাইকেলের বিখ্যাত নাটক "কৃষ্ণকুমারী"। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে জোড়াসাঁকো থিয়েটারেও মাইকেলের এই প্রহসন ও নাটক

অভিনীত হয়েছিল। ঐ সময় দেশে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলায় রামনারায়ণ তর্করত্ন বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রচারমূলক একখানি নাটক লেখেন। নাটকখানির নাম "নব নাটক"। ১৮৬৭ সালে এই নাটকখানি প্রথম অভিনীত হয়।

এ ছাড়াও দীনবন্ধু মিত্রের কয়েকখানি নাটক এই যুগে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। সেগুলির মধ্যে "নীলদর্পণ" সবচেয়ে বিখ্যাত।

অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র যখন নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে পদার্পণ করেছিলেন, তখন বঙ্গ কাব্যলক্ষ্মীর ভাণ্ডারে খানকয়েক সংস্কৃত নাটকের বাংলা তরজমা এবং খান কয়েক মৌলিক বাংলা নাটক মাত্র ছিল। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ব'লে কিছুই ছিল না। এতোক্ষণ যেসব রঙ্গালয়ের কথা বলা হ'লো, সেগুলি সবই ছিল ধনী পরিবারের শখের ব্যাপার— সেখানে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণ মানুষের প্রবেশের কোনও উপায় ছিল না।

এই অবস্থায় গিরিশচন্দ্র বাংলা নাট্যজগতে প্রবেশ করলেন। কিন্তু কী অপূর্ব সে প্রবেশ! অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলা নাট্য-সাহিত্য ও নাট্যশালা যেন কোনও জাদুকরের মায়াদণ্ড স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো— পত্রপুষ্পশোভায় বাঙ্গালীর নয়ন মুগ্ধ ক'রে দিলো!

পাঁচ

১৮৬৭ সাল। গিরিশচন্দ্রের বয়স তখন সবে তেইশ বছর। যৌবনের অপূর্ব শ্রী তাঁর সারা দেহে; বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ, গৌর কান্তি, উন্নত ললাট, আয়ত চক্ষু, বিশাল বক্ষ —নটের উপযুক্ত চেহারা বটে। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বর, অপরূপ বাচনভঙ্গী। তার ওপর কবি, কথকতা, যাত্রা ও থিয়েটার সম্পর্কে ছিল তাঁর দুর্বার প্রীতি। সুতরাং বাংলার নাট্যলক্ষ্মী যে তাঁকে সাদরে হাতছানি দিয়ে ডাকবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী!

ঐ সময়ে যাত্রার দল শিক্ষিত সমাজে হেয় ও নিন্দনীয় হয়ে পড়েছিল। অথচ থিয়েটারের জন্যে প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থ—মঞ্চ, দৃশ্য ইত্যাদি অল্প টাকায় হয় না। তাই গিরিশচন্দ্র ও তাঁর বন্ধুরা এক নূতন পথ বাৎলালেন। মঞ্চ ও দৃশ্য বাদ দিয়েই থিয়েটারের নাটক অভিনয় করা হবে যাত্রার রীতিতে। ঐ সকল নাটকে কুরুচি ও অশ্লীলতার অবকাশ থাকবে না, অথচ থিয়েটারের ব্যয়বাহুল্যও দূর হবে। তাই গিরিশচন্দ্র ঐ বছর (১৮৬৭) তাঁর কয়েকজন উৎসাহী বন্ধুর সঙ্গে মিলে বাগবাজারে একটি যাত্রার দল গ'ড়ে তুললেন। অভিনয়ের জন্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের "শর্মিষ্ঠা" নাটকখানিই মনোনীত হ'লো। কিন্তু যাত্রার প্রধান বৈশিষ্ট্য

হ'লো গান। তাছাড়া বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে থিয়েটারের নাটকগুলি খুবই প্রশংসা পেলেও সেগুলি জনসাধারণের কাছে কতখানি আদর পাবে, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। কারণ, বাঙ্গালী জনসাধারণের মন ও রুচি দীর্ঘকাল ধ'রে কবি, পাঁচালী, হাফ-আখড়াই, তরজা ও যাত্রাগানর মতো গীতিপ্রধান শিল্পের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে। তাই গিরিশচন্দ্র "শর্মিষ্ঠা" নাটকে কিছু গান জুড়ে দিয়ে তাকে জনসাধারণের রুচির উপযুক্ত ক'রে তুলতে চাইলেন। গিরিশচন্দ্র সেদিন যে রীতির প্রবর্তন করেছিলেন, তাই-প্রকৃতপক্ষে যাত্রাভিনয়ের উপযোগী নাটক রচনার প্রধান রীতি হয়ে উঠলো।

যাই হোক, গিরিশচন্দ্র ও তাঁর বন্ধুরা এখন আর-এক সমস্যার সম্মুখীন হলেন। এই নূতন গানগুলি লিখে দেবে কে? ঐ সময়ে প্রিয়মাধব বসু-মল্লিক গীতিকার হিসাবে খুবই প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর প্রধান সহযোগী উমেশচন্দ্র চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে প্রিয়মাধবের দরজায় ধরনা দিলেন। প্রিয়মাধববাবু কয়েক দিন এঁদের ঘোরালেন; কিন্তু গান বেঁধে দিলেন না। তখন গিরিশচন্দ্র তাঁর বন্ধুকে বললেন, "উমেশ, এই দু-একখানা গানের জন্যে এতো হীনতা কেন? এস, আমরা নিজেরা যেমন পারি বাঁধি।"

গিরিশচন্দ্র নিজেই কয়েকখানি গান রচনা ক'রে দিলেন।

গানগুলি অভিনয়কালে খুবই প্রশংসা পেলো। এইভাবে গিরিশচন্দ্র কবিরূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন।

"শর্মিষ্ঠা" অভিনয়ের পর বাগবাজারের শখের যাত্রার দলটি খুবই প্রশংসা পেলো এবং গিরিশচন্দ্র অভিনেতা, নাট্যপরিচালক ও গীতিকার হিসাবে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন।

এই সময়ে কলকাতায় অনেকগুলি ছোট-বড়ো পারিবারিক রঙ্গমঞ্চে নাটকের অভিনয় হচ্ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাই (রবীন্দ্রনাথের ভগিনীপতি) হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর জোড়াসাঁকো কয়লাহাটার বাড়িতে একটি নাট্যশালা স্থাপন করেছিলেন। সেখানে "কিছু কিছু বুঝি" নামে একটি প্রহসনের অভিনয় হচ্ছিল। অভিনয় খুব উঁচু দরের হয়েছিল। এই নাটকে অর্ধেন্দু-শেখর মুস্তফি নামে এক যুবক অসাধারণ অভিনয়শক্তি দেখিয়েছিলেন। তা দেখে মাইকেল মধুসূদন নাকি ব'লে উঠেছিলেন: "মৃত্তিকে রে বাবা, মৃত্তিকে!" মানে, এই অভিনয়ের তুলনায় আগেকার সব অভিনয়ই মাটি!

এমন অভিনয় দেখবার জন্যে দর্শকের ভিড় হওয়ারই কথা। কিন্তু পারিবারিক রঙ্গমঞ্চগুলির প্রধান ত্রুটি ছিল, সাধারণের জন্যে তার দরজা রুদ্ধ বা প্রায়-রুদ্ধ থাকতো। বাগবাজারের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকরা ঐ থিয়েটারের টিকিট

সংগ্রহ করতে না পেরে ক্ষুণ্ণ মনে যখন ফিরে এলেন, গিরিশচন্দ্র তখন তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "এক বছরের মধ্যেই আমরা আপনাদের থিয়েটার ক'রে দেখাবো।"

"শর্মিষ্ঠা" নাটকের সাফল্য গিরিশচন্দ্রকে সে সুযোগ এনে দিল। তিনি বন্ধুদের সঙ্গে মিলে একটি নাট্যশালা স্থাপনের পরিকল্পনা করলেন। এই থিয়েটারের নাম দেওয়া হ'লো "বাগবাজার এমেচার থিয়েটার।" মুখুজ্জে পাড়ার প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে নাট্যশালা স্থাপিত হ'লো (১৮৬৮)। এই থিয়েটারে অভিনয় করবার জন্যে "শর্মিষ্ঠা" নাটকের ভালো অভিনেতাদের বেছে নেওয়া হ'লো। কিন্তু এবার তাঁরা অভিনয়ের জন্যে পৌরাণিক নাটকের বদলে সামাজিক নাটকই বেছে নিলেন। সাজসজ্জার দিক থেকে সামাজিক নাটকে পৌরাণিক নাটকের চেয়ে খরচ কম। কিছুদিন আগে (১৮৬৬) দীনবন্ধু মিত্র "সধবার একাদশী" নামে একখানি নাটক লিখেছিলেন। গিরিশচন্দ্র ও তাঁর বন্ধুরা ঐ নাটকখানিকেই অভিনয়ের জন্যে বেছে নিলেন।

দীনবন্ধু তখন বিখ্যাত নাট্যকার। তিনি ১৮৬০ সালে "নীলদর্পণ" নামে একখানি নাটক লিখে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। ঐ সময়ে নীলকর সাহেবরা এ দেশে চাষীদের উপর কি রকম অত্যাচার করত, তার ভয়াবহ কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছিল। এই নাটক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল এবং তা ইউরোপীয় সমাজেও

চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। পাদরী লং সাহেব ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। "নীলদর্পণের" পর দীনবন্ধু তাঁর "নবীন তপস্বিনী" (১৮৬৩) নামে আর একখানি নাটক রচনা করেন। "সধবার একাদশী" তাঁর তৃতীয় রচনা। এই নাটক এর আগে বই আকারে প্রকাশিত হ'লেও অভিনীত হয় নি।

তাই "সধবার একাদশী" অভিনয়ের জন্যে নির্বাচন ক'রে বাগবাজার এমেচার থিয়েটার খুবই সুবুদ্ধির পরিচয় দিলেন। এতে কেবল তাঁদের মর্যাদাই বাড়লো না, এতে তাঁদের প্রথম অভিনয় রজনীর দিকে কলকাতার শিক্ষিত সমাজ কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলো।

অভিনেতা সংগ্রহের দিক থেকেও বাগবাজার এমেচার থিয়েটার খুবই কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। কিছুদিন আগে জোড়াসাঁকো কয়লাহাটার থিয়েটারে "কিছু কিছু বুঝি" প্রহসনে অভিনয় ক'রে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। অর্ধেন্দুশেখরের বাড়ি ছিল বাগবাজারে। সুতরাং পল্লীর এই এমেচার দলে সানন্দে তিনি যোগ দিলেন। এইভাবে বাংলার দুই নট চূড়ামণি, গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখর, একত্র মিলিত হলেন। এর চেয়ে নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে ঐতিহাসিক ব্যাপার আর কি হ'তে পারে? গিরিশচন্দ্র নিলেন নিমচাঁদের ও অর্ধেন্দুশেখর নিলেন জীবনচন্দ্রের ভূমিকা।

"সধবার একাদশী" ছিল সামাজিক নাটক। ঐ সময়ে সমাজে মদ্যপান ও ইংরেজী বুলি কপচানো ছিল শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর একটি মহৎ দোষ। দীনবন্ধু নিমচাঁদের চরিত্র সৃষ্টি ক'রে সমাজের ঐ জঘন্য দিকটিকে তীব্র কশাঘাত করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র নিজে মদ্যপান করতেন, ইংরেজী বুলির ওপরও তাঁর অসামান্য দখল ছিল। তাই এই চরিত্রটিকে তিনি আশ্চর্যরকম জীবন্ত ক'রে তুলে সবাইকে বিস্মিত ক'রে দিয়েছিলেন।

মুখুজ্জেপাড়ার প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ি নাটকের মহড়া চলতে লাগল। গিরিশচন্দ্র নিজে এই নাটকের জন্যে কতকগুলি গান রচনা ক'রে দিলেন। সাধারণ দর্শক যে নাটকে একটু বেশী গান চায়, এ ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল ছিল। গিরিশ-চন্দ্রের এই ধারণাটাই প্রায় এক শ বছর বাদে এখনও থিয়েটারওলাদের মনে বদ্ধমূল দেখা যায়—যদিও গিরিশচন্দ্রের আমলের সাধারণ দর্শক ও এখনকার সাধারণ দর্শকের রুচির মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য ঘটে গেছে।

ঐ বছর (১৮৬৮) শারদীয়া সপ্তমী পূজার দিন রাত্রিতে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে "সধবার একাদশীর" অভিনয় হ'লো। এই হ'লো গিরিশচন্দ্রের রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রবেশ।

পরবর্তী একটি অভিনয়ে লেখক দীনবন্ধু মিত্র দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজের সৃষ্ট নিমচাঁদকে রঙ্গমঞ্চে জীবিত অবস্থায় দেখে আনন্দে অধীর হন। অভিনয়-

শেষে তিনি গিরিশচন্দ্রকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বলেন : "তুমি না থাকলে এ নাটক অভিনীত হ'তো না, নিমচাঁদ যেন তোমার জন্যেই লেখা।" তিনি অর্ধেন্দুশেখরকে বলেন : "আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন, উহা improvement on the author. আমি এবার 'সধবার একাদশীর' নূতন সংস্করণে 'অটলকে লাথি মারিয়া গমন' লিখিয়া দিব।" এই নাটকে গিরিশচন্দ্রের অভিনয় সম্পর্কে বিচারপতি সারদা-চরণ মিত্র লিখেছিলেন : "সধবার একাদশী পূর্বে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সেদিনের অভিনয় দেখিয়া আমি আনন্দে আপ্লুত হইলাম। বয়োবৃদ্ধি বশতঃ ক্রমশ অনেক জিনিস ভুলিয়াছি, আরও কত ভুলিব। ইংরাজি, বাংলা, সংস্কৃত, অনেক নাটক পড়িয়াছি, অধিকাংশের নামমাত্র স্মরণ আছে। কিন্তু সে রাত্রির নিমচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় বোধ হয় কখনও ভুলিব না।"

বিখ্যাত অভিনেতা, নাট্যকার ও গিরিশচন্দ্রের সহযোগী অমৃতলাল বসু পরে গিরিশচন্দ্রের এই অভিনয় স্মরণ ক'রে লিখেছিলেন :

মদমত্ত পদ টলে, নিমে দত্ত রঙ্গস্থলে
প্রথম দেখিল নবনটগুরু তার ॥

পরবর্তী অভিনয়ে "সধবার একাদশী" যে রকম প্রশংসা পেয়েছিল, প্রথম অভিনয়ে তা না পেলেও, রঙ্গমঞ্চে গিরিশ-

চন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব হিসাবে তা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে, ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দেই গিরিশচন্দ্রের জীবনে একটি অধ্যায় সূচনা করে। ঐ বৎসরটি বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে আরও একটি কারণে বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছে—সেটি হ'লো, ঐ বছরই গিরিশচন্দ্রের বড় ছেলে পুত্র সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। এই সুরেন্দ্রনাথই পরে দানীবাবু নামে গিরিশচন্দ্র ও শিশিরকুমারের (ভাদুড়ীর) মধ্যবর্তী যুগে বাংলা রঙ্গমঞ্চের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাটরূপে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু ঐ বৎসরটি গিরিশচন্দ্রের কাছে অবিমিশ্র আনন্দের বৎসরও ছিল না। ঐ বৎসর তাঁর এক ভগিনী মারা যান। তার কিছুদিন বাদেই মেজো ভাই ও পরম স্নেহের আবাল্য সাথী কানাই-লালের অকাল মৃত্যু ঘটে। মৃত্যু আবাল্য গিরিশচন্দ্রকে বারে বারে আঘাত করেছে—ক্রমেই সে আঘাত নির্মম ও নিষ্করুণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র সকল আঘাত সহ্য করেছেন, তাঁর প্রতিভা ক্রমেই অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল হয়েছে। কিন্তু জীবনে তিনি মৃত্যুর কাছে কখনো হার মানেন নি।

ছয়

বাগবাজার এমেচার থিয়েটারে সাতবার "সধবার একাদশী" অভিনীত হয়। এর শেষবার অভিনয় হয় ১৮৭১ সালের তুর্গাপূজার সময়ে চোরবাগানের লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাড়িতে। এবার "সধবার একাদশীর" সঙ্গে দীনবন্ধুর লেখা প্রহসন "বিয়ে-পাগলা বুড়োও" অভিনীত হয়েছিল। এর পর বছর খানেক এমেচার থিয়েটারে আর কোনও নাটকের অভিনয় হয় নি। এই সময় তাঁরা দীনবন্ধুর অন্য একটি নাটক নিয়ে অভিনয়ের জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন। নাটকখানির নাম "লীলাবতী"।

এই সময়ে গিরিশচন্দ্র নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় ঐ নাটকের মহড়ায় যোগ দেন নি, দূরে দূরেই ছিলেন। তাই উপযুক্ত অভিনেতার অভাবে নাটকখানি অভিনয় করা সম্ভবপর হচ্ছিল না। এদিকে চুঁচুড়ায় এই নাটকখানিকে সে যুগের উদীয়মান সাহিত্য-সূর্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয় সরকার প্রভৃতি কয়েকজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি মঞ্চস্থ করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৮৭২ সালের মার্চ মাসে চুঁচুড়ায় লীলাবতীর অভিনয় হ'লো। ঐ অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো তখনকার অমৃতবাজার পত্রিকা। বাগ-বাজার এমেচার দলের পক্ষে তা কিছুটা ঈর্ষার কারণ

হয়ে উঠলো। কেবল তাই নয়, ঐ সময় দীনবন্ধু মিত্র নিজে অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখরকে বললেন, “তোমরা ও নাটক পারবে না।”

এই অবস্থায় বাগবাজার এমেচার থিয়েটারের লোকেরা চুপচাপ ব'সে থাকতে পারলেন না। সদলবলে অর্ধেন্দুশেখর ছুটলেন গিরিশচন্দ্রের কাছে, গিয়ে বললেন, “চুঁচুড়ার দলের কাছে আমরা হেরে যাব, আর তুমি বসে বসে দেখবে?”

সুতরাং সব কাজ ফেলে ছুটলেন গিরিশচন্দ্র। শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালের বাইরের বাড়িতে রঙ্গমঞ্চ তৈরী হ'লো; ধর্মদাস শূর দৃশ্যপটগুলি স্বহস্তে আঁকলেন; কিছু চাঁদা তুলে অন্যান্য ব্যবস্থাও সব হ'লো। থিয়েটারের নামও বদলে করা হ'লো শ্যামবাজার নাট্যসমাজ। ঐ বছর (১৮৭২) মে মাসে এক শনিবারে “লীলাবতী” মঞ্চস্থ করা হ'লো। প্রথম রজনীতে ঝড়বৃষ্টির ফলে অভিনয়ের ব্যাঘাত হ'লেও পর পর তিন শনিবার সন্ধ্যায় লীলাবতীর অভিনয় হ'লো।

নায়ক ললিতমোহনের ভূমিকায় নামলেন গিরিশচন্দ্র। অভিনয় দেখে সকলে মুগ্ধ হলেন। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র নিজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি গিরিশচন্দ্রকে বললেন—“তোমাদের অভিনয়ের সঙ্গে চুঁচুড়ার দলের তুলনাই হয় না। আমি পত্র লিখব—হুয়ো বঙ্কিম!” গিরিশচন্দ্রের অভিনয় সম্পর্কে তাঁকে বললেন—“আমার কবিতা যে এমন ক'রে পড়া যায়, তা আমি জানতাম না।” সেকালের বিখ্যাত

ডাক্তার কানাইলাল দে এই অভিনয় দেখে এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি ঠাকুর বাড়িতে তাঁদের থিয়েটার সম্পর্কে ব'লে এসেছিলেন—"আপনাদের অভিনয় হ'লো সোনার খাঁচায় দাঁড়কাক পোষা।"

লীলাবতীর সুখ্যাতি শীঘ্রই ছড়িয়ে পড়লো। অভিনয় দেখবার জন্যে দলে দলে লোক এসে স্থানাভাবে ফিরে যেতে লাগলো। এই অবস্থায় থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন, এখন একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করা হ'ক্। মনে রাখা দরকার, ঐ সময়ে দেশে কোনো স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ছিল না, যাতে নিয়মিতভাবে নাটক অভিনীত হ'তে পারতো বা দর্শকরা ইচ্ছামতো গিয়ে নাটক দেখে আসতে পারতেন। কয়েক বছর আগেও নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া থিয়েটার দেখার সুযোগ সাধারণ লোকের ছিল না। এই বিশ্রী অবস্থার প্রতিকার করবার জন্যে বাগবাজার এমেচার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এখন নিয়মিত অভিনয়ের জন্যে একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের প্রস্তাব ক'রে নাট্যশালার ইতিহাসে আর একটি নূতন অধ্যায় সূচনা করা হ'লো। আগের বারের মতো এবারও প্রধান উদ্‌যোক্তা ছিলেন গিরিশচন্দ্র নিজে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রস্তাবটিকে কার্যকরী করবার কাজে তিনি অংশ নিতে পারলেন না।

অতি সামান্য কারণেই সহযোগীদের সঙ্গে তাঁর

মনান্তর ঘটলো, ফলে এই স্থায়ী রঙ্গালয় স্থাপনের ব্যাপার থেকে তাঁকে দূরে থাকতে হ'লো। মনান্তর হ'লো এই নূতন থিয়েটারের নামকরণ নিয়ে। তখনকার দিনের খ্যাতনামা "ন্যাশন্যাল পেপার" পত্রিকার সম্পাদক নবগোপাল মিত্র এই নূতন থিয়েটারের নামকরণ করতে চাইলেন "ন্যাশন্যাল থিয়েটার"। নবগোপালবাবুর কাছে "ন্যাশন্যাল" কথাটি খুবই প্রিয় ছিল। কিছু একটা নূতন প্রতিষ্ঠান হ'লেই তার আগে তিনি "ন্যাশন্যাল" কথাটি জুড়ে দিতেন। তাই তাঁকে ঠাট্টা ক'রে লোকে নাম দিয়েছিল "ন্যাশন্যাল মিত্রি"। ঐ যুগে যাঁরা জাতীয়তাবাদে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন, গিরিশচন্দ্র তাঁদের একজন হ'লেও এই নামটিতে তিনি আপত্তি করলেন। আপত্তি করলেন দেশকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন ব'লেই। তিনি বললেন, "আমাদের এই থিয়েটারের দৃশ্যপট, সাজসজ্জা ও মঞ্চগৃহ এমন কিছু অসাধারণ হবে না, যাতে এ-কে "ন্যাশন্যাল" নাম দেওয়া যেতে পারে। আমরা কয়েকজন সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ একটি সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপন করছি, এর যা দৈন্যদশা, তাতে একে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ বললে হাস্যকর ব্যাপার হবে।"

গিরিশচন্দ্রের এই আপত্তি কেউ কানে তুললেন না। থিয়েটারের নাম "ন্যাশন্যাল থিয়েটারই" হ'লো। গিরিশচন্দ্র ছিলেন ভাবপ্রবণ, অভিমানী ও আত্মবিশ্বাসী লোক। তিনি "ন্যাশন্যাল থিয়েটার" থেকে দূরে রইলেন। জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়ির মস্ত উঠোন মাসিক তিরিশ টাকায়

ভাড়া নিয়ে সেখানেই এই সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হ'লো। টিকিট বিক্রি ক'রে অভিনয় দেখানো এই প্রথম। ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত নাটক "নীলদর্পণ" দিয়েই এই রঙ্গমঞ্চের উদ্‌বোধন হ'লো। এই নাটকখানি ১৮৬০ সালে ছাপা হ'লেও এতোদিন অভিনীত হয় নি। প্রথম জাতীয় রঙ্গালয়ের জন্যে প্রথম নাটক হিসাবে এটি উপযুক্ত ছিল। মহা সমারোহে নীলদর্পণের অভিনয় হ'লেও গিরিশচন্দ্রের অভাব সকলেই মনে মনে অনুভব করলেন। দীনবন্ধুও দুঃখ ক'রে বললেন: "একজন উৎকৃষ্ট গম্ভীর অংশের অভিনেতা যোগদান করেন নাই বলিয়া অঙ্গহানি হইয়াছে।"

গিরিশচন্দ্র থিয়েটার ছাড়লেও অভিনয় তাঁকে ছাড়লো না। তিনি বাগবাজারে একটি শখের যাত্রার দল গ'ড়ে তুললেন। তাতে মণিলাল সরকার রচিত "ঊষাহরণ" নাটক অভিনয়ের জন্যে তৈরী করা হ'লো। গিরিশচন্দ্র নিজে এই নাটকের জন্যে ছাব্বিশখানি গান লিখে দিলেন। এই যাত্রার আসরে "ন্যাশন্যাল থিয়েটারের" কর্তৃপক্ষকে বিদ্রূপ ক'রে একটি গান গাওয়া হয়। গানটি গিরিশচন্দ্রের রচনা। এই গানের প্রথম দু' লাইন হ'ল:

লুপ্তবেণী বইছে তেরোধার;
তাতে পূর্ণ অর্ধ ইন্দু কিরণ সিঁদুর মাখা মতির হার॥

অভিনেতা ও নাট্যকার অমৃতলাল বসু ঐ সময়ে ন্যাশন্যাল থিয়েটারে এসে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ঐ গানের ব্যাখ্যা দেন। তা থেকে বোঝা যায়, লুপ্তবেণী হলেন বেণী মিত্র ; তিনি অভিনয় করতেন না, অথচ কমিটির মাথার উপরে থাকতেন ; গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-সঙ্গম। পূর্ণ হলেন পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ; অর্ধ ইন্দু হলেন অর্ধেন্দু মুস্তফি ; কিরণ হলেন কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মতি হ'লেন মতিলাল সুর ; ইত্যাদি।

গিরিশচন্দ্রের যাত্রার আসরের এই বিদ্রূপাত্মক গানটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল, এমন কি যাঁদের উদ্দেশ ক'রে এটি লেখা হয়েছিল, তাঁরাও খুবই আনন্দ পেতেন।

"নীলদর্পণ" নাটকের অভিনয় সম্পর্কে ঐ সময় পর পর দু'খানি চিঠি "ইণ্ডিয়ান মিরর" কাগজে বেরোয়। অমৃত-বাজার পত্রিকা নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন, এই চিঠি দু'খানি তারই তীব্র প্রতিবাদ। এতে অভিনয়, রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা সম্পর্কে যে রকম নির্মম সমালোচনা করা হয়েছিল, তাতে ব্যক্তিগত বিদ্বেষই সবচেয়ে বেশী ফুটে উঠেছিল। গিরিশচন্দ্রের অন্য রচনা ও এই দু'খানি চিঠির ভাব ও ভাষাপ্রয়োগভঙ্গির মধ্যে এমন সাদৃশ্য আছে, যাতে গিরিশচন্দ্রকেই এই চিঠি দু'খানির বেনামী রচয়িতা মনে করা যায়। তা সত্যি হ'লে গিরিশ-চন্দ্র যে ঐ সময় যথেষ্ট সংযম ও সুরুচি দেখাতে পারেন

নি, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তবে আটাশ বছরের এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী, আত্মবিশ্বাসী ও প্রতিভাবান্ যুবকের পক্ষে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

"নীলদর্পণ" অভিনীত হওয়ার পর ন্যাশন্যাল থিয়েটারে দীনবন্ধুর "সধবার একাদশী", "নবীন তপস্বিনী", "লীলাবতী", "বিয়ে-পাগলা বুড়ো" ও "জামাই বারিক" অভিনীত হয়। ন্যাশন্যাল থিয়েটারেই সর্বপ্রথম প্রম্‌টার বা স্মারক নিযুক্ত করা হয়েছিল ব'লে গিরিশচন্দ্র তাঁর "নট-চূড়ামণি অর্ধেন্দু-শেখর" নামক রচনায় লিখেছিলেন। "ন্যাশন্যাল থিয়েটার হইতেই প্রম্‌টার নামে একজন নেপথ্য অভিনয়কারীর সৃষ্টি হইয়াছে। প্রম্‌টার বলেই নূতন নূতন নাটক বুধবার ও শনিবারে অভিনীত হইত।"

দীনবন্ধুর অনেকগুলি নাটক পর পর অভিনীত হওয়ায় দর্শকরা পাছে বিরক্ত হন, এই ভয়ে ন্যাশন্যাল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ মাইকেল মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী" নাটক অভিনয় করবেন স্থির করলেন। কিন্তু ভীমসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করবে কে? তা এক কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। তখন গিরিশচন্দ্রের কাছে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ উমেদার হলেন। গিরিশচন্দ্র আবার ন্যাশন্যাল থিয়েটারে এসে যোগ দিলেন।

তিনি ন্যাশন্যাল থিয়েটারে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে একটি অসুবিধায় পড়েছিলেন। এই থিয়েটারে টিকিট বিক্রি ক'রে অভিনয় দেখানো হ'তো। তার মানে আইনত

থিয়েটারটি ছিল পেশাদারী। গিরিশচন্দ্র সওদাগরী আফিসে চাকবি করতেন; আফিসের কর্তারা পেশাদারী থিয়েটারে অভিনয় করাকে পাছে খারাপ চোখে দেখেন, এই ভয়ে তিনি ইতস্তত করছিলেন। তাই তিনি বললেন, বিজ্ঞাপনে তাঁর নামের পাশে এমেচার বা অবৈতনিক লিখে দিতে হবে। এতে অন্যান্য অভিনেতারা অনেকে আপত্তি করলেন। কারণ এর মানে হ'লো, তাঁরা যে পেশাদারী তা স্পষ্ট ক'রে বলা। কিন্তু এবারও গিরিশচন্দ্র তাঁর সংকল্পে অটল রইলেন। অথচ তাঁকে বাদ দিয়েও "কৃষ্ণকুমারী" নাটক মঞ্চস্থ করা প্রায় অসম্ভব। তাই শেষে একটা রফা হ'লো। বিজ্ঞাপনে গিরিশচন্দ্রের নাম রইলো না, কেবল রইলো "একজন খ্যাতনামা অবৈতনিক অভিনেতা"—a distinguished amateur.

অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় ভীমসিংহের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব সাফল্য সম্পর্কে বলেন: "ভীমসিংহের ভূমিকায় গিরিশবাবুর রিহারশ্যাল দেখিয়া রাজা চন্দ্রনাথ (নাটোরের মহারাজা) স্বহস্তে গিরিশবাবুকে নিজের রাজবেশ পরাইয়া তাঁহার কটিদেশে নিজের তরবারি ঝুলাইয়া দিলেন।"

১৮৭৩ সালের ২২-এ ফেব্রুয়ারি শনিবার ন্যাশন্যাল থিয়েটারে "কৃষ্ণকুমারী" প্রথম মঞ্চস্থ হয়। ৮ই মার্চ তারিখে পুনরভিনয় হয়, কিন্তু ঐ অভিনয়ই ন্যাশন্যাল থিয়েটারের শেষ অভিনয়। ঐ অভিনয় রজনীতে গিরিশচন্দ্রের লেখা একখানি

গান দিয়ে দর্শকদের কাছে ন্যাশন্যাল থিয়েটার শেষ বিদায় প্রার্থনা করে ঃ

কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়।
সাধি ওহে সুধীব্রজ ভুলো না আমায়॥

* * *

নির্মাইয়ে নাট্যালয় আরম্ভিব অভিনয়,
পুনঃ যেন দেখা হয়, এ মিনতি পায়॥

এইভাবে গিরিশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বাগবাজার এমেচার থিয়েটার বিভিন্ন নামে বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে এক যুগান্তর ঘটিয়ে গিরিশচন্দ্রের বিদায় সংগীত দিয়েই তার কর্তব্য সমাপন করলো।

সাত

এই বছর গিরিশচন্দ্রের একটি মেয়ে হয়। কিন্তু অবিমিশ্র আনন্দ গিরিশচন্দ্র তাঁর জীবনে কখনো পান নি। এবারও পেলেন না। ঐ বছরই কলেরা রোগে তাঁর ছোট ভাই ক্ষীরোদচন্দ্রের মৃত্যু হ'লো।

গিরিশচন্দ্র প্রথমে ন্যাশন্যাল থিয়েটার থেকে দূরে থাকলেও পরে তিনি এর অন্যতম কর্ণধার হয়ে উঠেছিলেন। তাই থিয়েটার সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়া তাঁর কাছে খুবই বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চেয়েও বেদনাদায়ক ব্যাপার শীঘ্রই ঘটলো। ন্যাশন্যাল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিবাদ বাধলো—প্রধানত টাকা-পয়সার ব্যাপার নিয়ে। এই বিবাদের পরিণতি হিসাবে ন্যাশন্যাল থিয়েটার দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একটির নাম রইলো ন্যাশন্যাল থিয়েটার, অপরটির নাম হ'লো হিন্দু ন্যাশন্যাল থিয়েটার।

গিরিশচন্দ্র রইলেন ন্যাশন্যাল থিয়েটারে, আর অর্ধেন্দুশেখর হিন্দু ন্যাশন্যাল থিয়েটারে। ন্যাশন্যাল থিয়েটারের হাতে দলের মঞ্চ ও দৃশ্যপট থাকায় তাঁরা শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন ক'রে অভিনয় দেখাবার চেষ্টা করলেন। তাঁরা মার্চ

মাসে (১৮৭৩) টাউন হলে নেটিভ হাসপাতালের (এখনকার মেয়ো হাসপাতাল) সাহায্যের জন্যে "নীলদর্পণ" অভিনয় করলেন। নীলদর্পণে অর্ধেন্দুশেখর উড সাহেবের ভূমিকায় নামতেন। তিনি এখন অন্য দলে—হিন্দু ন্যাশন্যাল থিয়েটারে—থাকায় ঐ ভূমিকায় নামলেন গিরিশচন্দ্র নিজে। উড সাহেবের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অভিনয় এমন নিখুঁত হয়েছিল যে, অনেক ইংরেজ দর্শকও তাঁকে সত্যি সাহেব ব'লে ভুল করেছিল।

এই অভিনয়ে ২১০ টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল। ঐ টাকা নেটিভ হাসপাতালকে সাহায্য হিসাবে দেওয়া হয়। থিয়েটারে সাহায্য রজনীর দৃষ্টান্ত এই প্রথম। দুঃস্থের সেবায় যে-গিরিশচন্দ্র বিপদ তুচ্ছ ক'রে অগ্রসর হতেন, তিনি যে এমন একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন, তা-ই ছিল স্বাভাবিক। এর কিছুদিন বাদে ন্যাশন্যাল থিয়েটার আবার একটি সাহায্য রজনী করেন। "তখন সধবার একাদশী" অভিনয় করা হয়। ঐ অভিনয় থেকে যে টাকা পাওয়া যায়, তা "ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশনের" দাতব্য বিভাগকে দেওয়া হয়।

ওদিকে হিন্দু ন্যাশন্যাল থিয়েটারের হাতে মঞ্চ ও দৃশ্যপট না থাকায় তাঁরা প্রথমে লিণ্ড্‌সে স্ট্রীটের অপেরা হাউস ভাড়া নিয়ে অভিনয় দেখাতে চেষ্টা করেন। তারপর ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার হিসাবে ঢাকায় চ'লে যান। ঢাকায় তাঁরা বেশ জমিয়ে বসেন। হিন্দু ন্যাশন্যালের সুখ্যাতি ঢাকা থেকে শীঘ্রই

কলকাতায় পৌঁছে। তখন ন্যাশন্যাল থিয়েটারও ঢাকা যাওয়ার লোভ সামলাতে পারে না, শীঘ্রই ঢাকায় গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু নানা কারণে গিরিশচন্দ্র ঢাকা যেতে পারেন নি। তাই ন্যাশন্যাল থিয়েটার ঢাকায় তেমন আসর জমাতে পারলো না। কেবল তাই নয়, অভিনেতাদের অনেকেই অসুখে পড়লেন। তখন তাঁরা বাধ্য হয়ে স্টেজ, সিন ইত্যাদি হিন্দু ন্যাশন্যাল থিয়েটারের হাতে তুলে দিয়ে কলকাতা চ'লে আসতে বাধ্য হলেন। এর পর আদি ন্যাশন্যাল থিয়েটারের এই দুই দল আবার মিলিত হলেন।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে দারুণ দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যু ঘটলো। মাইকেলের অসহায় সন্তানদের সাহায্যকল্পে ন্যাশন্যাল থিয়েটার ১৬ই জুলাই তারিখে "কৃষ্ণকুমারী নাটক" মঞ্চস্থ করলেন। এই অভিনয়ে প্রায় সকল খ্যাতনামা অভিনেতাই যোগ দিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র মহাকবির উদ্দেশে একটি গান রচনা করেন। নাটক শুরু হওয়ার আগে ঐ গানটি গাওয়া হয়। ঐ গানের প্রথম দু' লাইন ছিল ঃ

কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে।
মধুহীন বঙ্গভূমি হইয়াছে এতদিনে॥

এর কিছুদিন বাদে ন্যাশন্যাল থিয়েটার বাংলাদেশের বাইরে অভিনয় দেখাবার জন্যে চ'লে গেল। আফিসের কাজে ব্যস্ত থাকায় গিরিশচন্দ্র কলকাতেই রয়ে গেলেন।

এই সময় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে দ্রুত কয়েকটি ঘটনা ঘটে। কলকাতার বিখ্যাত ধনী আশুতোষ দেবের বাড়িতে কয়েক বছর আগে বাংলা শকুন্তলা নাটকের অভিনয়ের কথা আগেই বলেছি। তখন আশুতোষবাবুর (ছাতু বাবুর) দৌহিত্র শরৎ ঘোষ মশায় বিশ হাজার টাকার গয়না প'রে শকুন্তলার ভূমিকায় নেমেছিলেন। সেই শরৎবাবুর বয়স এখন বেড়েছে, রঙ্গমঞ্চের একনিষ্ঠ সেবক ও দক্ষ অভিনেতা ব'লে তিনি এখন স্বীকৃতি পেয়েছেন। মরবার কিছুদিন আগে মহাকবি মাইকেল তাঁকে বলেছিলেন যে, "স্ত্রীভূমিকায় ছেলেদের দিয়ে অভিনয় করালে তা স্বাভাবিক হয় না।" মাইকেলের উপদেশমতো শরৎচন্দ্র ঘোষ একটি রঙ্গালয় স্থাপন করেন। রঙ্গালয় স্থাপিত হয় এখনকার বীডন স্ট্রীট ডাকঘরের কাছেই। এখনকার দিনের থিয়েটারের সঙ্গে তুলনাই করা যায় না তার। রঙ্গালয়টি তৈরী হয় মাটির দেওয়াল ও খোলার চাল দিয়ে। এমন কি স্টেজের প্ল্যাটফর্মটিও ছিল সিমেন্ট-করা মাটির বেদী।

থিয়েটারের নাম হলো "বেঙ্গল থিয়েটার"। বেঙ্গল থিয়েটারে মেয়েদের ভূমিকা মেয়েদের দিয়ে অভিনয় করাবার ব্যবস্থা হয়। এ নিয়ে তাঁদের দুর্নাম ও সমালোচনার অন্ত থাকে না। তা হ'লেও তাঁরা এই ব্যবস্থা ক'রে যে রঙ্গালয়ের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনে দিয়েছেন, একথা সত্যি। তবে বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে অর্ধেন্দুশেখর,

গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের সম্পর্ক না থাকায় তাঁদের কিছুটা অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল।

এদিকে হিন্দু ন্যাশন্যাল থিয়েটারের নাম বদলে' হয় গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার। অল্প কিছু দিন ন্যাশন্যাল থিয়েটার নিজেদের পৃথক নাম ও অস্তিত্ব বজায় রাখলেও তারা শীঘ্রই এসে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে যোগ দেয়। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটারের মতো তাঁদের নিজস্ব বাড়ি ছিল না। তাই তাদের মনে একটি ক্ষোভ ছিল। এই ক্ষোভ দূর করবার জন্যে এই সময়ে ভুবনমোহন নিয়োগী নামে এক ধনী ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন: "জমি লিজ নিয়ে থিয়েটার তৈরি কর, আমি টাকা দেব।"

অমনি উৎসাহের সঙ্গে কাজ শুরু হয়ে গেল। এখন যেখানে বীডন স্ট্রীটে মিনার্ভা থিয়েটার রয়েছে, সেখানেই একটা পোড়ো জমি ছিল। সেই জমি লিজ নিয়ে থিয়েটার তৈরী করা হ'লো। অবশ্য সে থিয়েটারের সঙ্গেও আজকালকার সুরম্য প্রাসাদোপম থিয়েটারের কোনও মিলই নেই। এই থিয়েটারের ছিল কাঠের বেড়া, করোগেটেড টিনের ছাত। ঐ সময় ডেভিড গ্যারিক ব'লে এক চিত্রকর আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হয়ে এদেশে এসেছিলেন, তিনি কতকগুলি সিন এঁকে দিলেন। গোড়ার দিকে এই থিয়েটারে অর্ধেন্দুশেখর ও গিরিশচন্দ্র দু'জনেই ছিলেন না; তাঁরা পরে এসে যোগ দিলেন। আগে এখানে স্ত্রী-চরিত্র

পুরুষরাই অভিনয় করতেন। ১৮৭৪ সালের মাঝামাঝি থেকে এখানেও স্ত্রী-চরিত্রগুলি মেয়েদের দিয়ে অভিনয় করাবার ব্যবস্থা হয়।

১৪ই ফেব্রুয়ারি এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস "মৃণালিনী" নাটকাকারে মঞ্চস্থ হ'লো। ঐ নাটকে গিরিশচন্দ্র "পশুপতির" ভূমিকায় অসামান্য অভিনয় নৈপুণ্য দেখালেন। তাঁর সহযোগী অভিনেতা ও নাট্যকার অমৃতলাল বসু বলেন : "এক পশুপতির ভূমিকার জন্যেই যে কোন দেশে গিরিশ রাজসম্মানে ভূষিত হইতেন। সে মধুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর আর শুনিব না, প্রকৃত ভাবের অভিব্যক্তিও আর দেখিব না।" বিখ্যাতা অভিনেত্রী বিনোদিনীও বলেন : (গিরিশচন্দ্রের পশুপতির ভূমিকায় অভিনয়) "স্মরণ হইলে আজও দেহ কণ্টকিত হয়। এই অর্ধশতাব্দীর মধ্যে এরূপ অভিনয় আর দেখিলাম না।"

"মৃণালিনীর" পর মার্চ মাসে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস "বিষবৃক্ষ" নাটকাকারে মঞ্চস্থ করেন। ঐ উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন গিরিশচন্দ্র নিজে। তিনি নিজে নগেন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

এর পর কিছুদিন তিনি রঙ্গমঞ্চ থেকে দূরে থাকেন। ঐ সময়ে তাঁর জীবনে যে পারিবারিক ও বৈষয়িক দুর্যোগ আসে, তাতে গিরিশচন্দ্রের মতো দৃঢ়চিত্ত বলিষ্ঠ পুরুষকেও কাতর ও অভিভূত ক'রে ফেলে। গিরিশচন্দ্রের জীবনে

মৃত্যু বহু আঘাত হেনেছে। এবার সে হানলো কঠিনতম আঘাত।

তাঁর স্ত্রী অবোধ পুত্রকন্যাকে তাঁর কোলে রেখে পৃথিবী থেকে চ'লে গেলেন। এ আঘাত গিরিশচন্দ্রের কাছে দুঃসহ হয়ে উঠলো। শোকের সঙ্গে এসে জুটলো অনুতাপ। অবহেলা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন—সবই যিনি নীরবে দিনের পর দিন সহ্য ক'রে এসেছিলেন, তাঁকে অকস্মাৎ হারিয়ে গিরিশচন্দ্র যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। শোকে অনুতাপে তাঁর মন জর্জরিত হয়ে গেল। তাঁর মনে হ'লো, তিনি বড় অপরাধ করেছেন। তাঁর মতো অপরাধী কে আছে!···

কিছুদিন আগে তাঁর ছোট ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছিল। হারানো ভাই ও স্ত্রীর শোকে তাঁর কবি হৃদয় কিভাবে উদ্‌বেলিত হয়ে উঠেছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ঐ সময়ে লেখা কয়েকটি কবিতা থেকে। কবিতাগুলির নাম "শৈশব বান্ধব," "আঁধার," "বাঁশরী," "শশী" ও "গিরি"। কবিতাগুলি বেদনার আকুলতায় পূর্ণ।

বালির তুফান উঠে, ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটে,
প্রাণিশূন্য তবু যেন সদা হাহাকার,
ধূধূ ধূধূ ধূধূকার দূর চক্রসীমা তার
উপমা স্থল একমাত্র হৃদয় আমার।

(আঁধার)

শোকে-দুঃখে তাঁর মন যখন এমনি মরুভূমির মতো দুঃসহ হাহাকারে পূর্ণ হয়েছে, তখন এলো অন্যদিক থেকে আবার চূড়ান্ত আঘাত, সে আঘাত প্রিয়জনের বিরহ নয়। নিজের মাতৃহীন সন্তানদের মুখে অন্ন দেওয়ার সমস্যা। হঠাৎ এটকিন্‌সন্ সাহেবের সওদাগরী আফিস গেল উঠে। গিরিশচন্দ্র বেকার হলেন। গিরিশচন্দ্রের কাছে সংসার দুঃসহ হয়ে উঠলো।

গিরিশচন্দ্র সান্ত্বনা লাভের জন্যে মদ ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনের মধ্যে আশ্রয় নিতে চাইলেন। কিন্তু তাতেও কোনও শান্তি পেলেন না। বাড়ি ফিরলেই শূন্য ঘরের দুঃসহ স্মৃতি তাঁকে পোড়াতে লাগলো। গৃহ যেন তাঁর কাছে ভয়ংকর হয়ে উঠলো। এই অবস্থায় কিছুদিনের জন্যে তিনি বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চ'লে যাবেন ঠিক করলেন। শীঘ্রই তাঁর সে রকম একটি সুযোগ জুটলো। ফ্রাইবার্জার কোম্পানিতে তিনি একটি চাকরি পেলেন। এই কোম্পানি তাঁকে মাল কিনবার জন্যে ভাগলপুর পাঠিয়ে দিলো। গিরিশচন্দ্র তাঁর শিশু পুত্র-কন্যাকে তাঁর বড়দিদির হাতে তুলে দিয়ে ভাগলপুর চ'লে গেলেন। কিন্তু স্মৃতিও মানুষের সঙ্গে যায়। ভাগলপুরে গিয়েও তিনি শান্তি পেলেন না। তাঁর মনের দুঃসহ বেদনা তিনি ঐ সময় তাঁর "বাঁশরী," "শশী," "আজি" ও "গিরি" কবিতায় প্রকাশ করেছেন।

মাস ছয়েক তিনি ভাগলপুরে ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি

কোম্পানির মাল কেনার কাজ শেষ ক'রে ফেললেন, তারপর মাহারা ছেলেমেয়ের কাছে ফেরবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু ফেরবার পথেও বাধা পড়লো—বাড়ি ফেরবার জন্যে যখন তিনি তৈরী, তখন এক রাত্রিতে তাঁর যথাসর্বস্ব চুরি হয়ে গেল। এমন কি বাড়িতে চিঠি লেখবার জন্যে টিকিট কেনার পয়সাও হাতে রইলো না। ঐ সময় অত্যন্ত অপমানিত হয়ে পাঁচটি টাকা এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের কাছে ভিক্ষা নিয়ে তাঁকে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল।

কলকাতায় ফিরে এসে গিরিশচন্দ্র ফ্রাইবার্জার কোম্পানির আফিস ছেড়ে দিলেন। ঐ সময় "ইণ্ডিয়ান লীগ" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল কলকাতায়। অমৃতবাজারের সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের অনুরোধে গিরিশচন্দ্র ঐ প্রতিষ্ঠানে হেড ক্লার্কের পদ নেন। ঐ সময়ে তাঁর বড়দিদি ও বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে তিনি আবার বিয়ে করেন। এবার তাঁর বিয়ে হয় কলকাতার বিখ্যাত লালচাঁদ মিত্রের নাতীর মেয়ের সঙ্গে।

বিয়ের পর কয়েক মাস যেতে না যেতেই গিরিশচন্দ্র কলেরা রোগে আক্রান্ত হলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর দেহের অমিত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে এলো। সকলেই তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দিলেন। কিন্তু অনেকখানি অপ্রত্যাশিতভাবেই গিরিশচন্দ্র সে যাত্রা বেঁচে গেলেন। এর পর গিরিশচন্দ্রের জীবনে যেন শুভদিনের আলো দেখা দিল। তাঁর সংসার

আবার সুখে ও শান্তিতে ভরে উঠলো। কিছু দিন বাদে ইণ্ডিয়ান লীগ উঠে গেলো। তিনি পার্কার কোম্পানির হিসাবরক্ষকের পদে নিযুক্ত হলেন।

১৮৭৬ সালের গোড়ার দিকে গিরিশচন্দ্র আবার গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে এসে যোগ দিলেন। গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার শুধু নামেই ন্যাশন্যাল ছিল না, মনোভাবের দিক থেকেও তা জাতীয়তাবাদে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিল। ফলে শীঘ্রই ইংরেজ সরকারের সঙ্গে তার সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠলো।

ঐ বছর জানুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে ইংলণ্ডের যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ (পরবর্তী কালে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড) কলকাতায় এলে হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ ক'রে আনলেন।

জাতীয়তাবাদী বাঙ্গালী সমাজে এর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন শুরু হ'লো। এই ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার একটি প্রহসন মঞ্চস্থ করলেন। প্রহসনটির নাম "গজদানন্দ ও যুবরাজ"। "গজদানন্দ" প্রহসনের প্রস্তাবনা ও গান গিরিশচন্দ্র নিজে লিখে দিলেন। গজদানন্দ যে জগদানন্দের ব্যঙ্গরূপ, তা বুঝতে কারও বিলম্ব হ'লো না। শীঘ্রই পুলিশ এটিকে রাজদ্রোহমূলক প্রহসন ব'লে বন্ধ ক'রে দিল। তখন ঐ প্রহসনটিকে আবার 'হনুমানচরিত্র' নাম দিয়ে মঞ্চস্থ করা হ'লো। ঐ অভিনয়ও পুলিশের আদেশে বন্ধ হ'লো।

তখন পুলিশকে ব্যঙ্গ ক'রে গ্রেট ন্যাশন্যাল আর একটি প্রহসন মঞ্চস্থ করলেন—প্রহসনটির নাম The Police of Pig and Sheep. পুলিশ কমিশনার স্যার স্টুয়ার্ট হগ্ ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ল্যাম্ সাহেবকে ঐ প্রহসনে বিদ্রূপ করা হ'লো। ফলে পুলিশ খুবই ক্রুদ্ধ হ'লো এবং ডেপুটি পুলিশ কমিশনার সদলে গিয়ে গ্রেট ন্যাশন্যালের ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর ও বেলবাবু প্রমুখ আটজন অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করলো। পুলিশ তাদের অভিযোগে প্রহসনগুলির কথা তুললো না। বললো, এঁরা "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নামে একটি অশ্লীল নাটক অভিনয় করেছেন, তাই এঁদের ধরা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে উপেন্দ্রবাবু ও অমৃতলালের একমাস ক'রে বিনাশ্রম কারাদণ্ড হ'লো। অন্যান্য বন্দীরা মুক্তি পেলেন। উপেন্দ্রবাবু ও অমৃতলালের পক্ষে হাইকোর্টে আপীল করা হ'লো। হাইকোর্টে "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটক অশ্লীল প্রমাণিত না হওয়ায় উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল মুক্তি পেলেন।

কিন্তু ইংরেজ সরকার নীরব রইলো না। জাতীয় জাগরণে বাংলার রঙ্গমঞ্চ যে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নিচ্ছে, সে বিষয়ে তারা সচেতন হ'লো। তাই তারা ১৮৭৬ সালের শেষের দিকে নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন (Dramatic Performance Control Act) পাস করলো। এর বিরুদ্ধে দেশময় তুমুল প্রতিবাদ উঠলো। প্রতিবাদে কোনও ফল

হ'লো না। তবে ঐ আইন দিয়েও যে ইংরেজ সরকার জাতীয় রঙ্গমঞ্চকে জাতীয় জাগরণের কাজে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত করতে পারে নি, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ গিরিশচন্দ্র নিজেই। তাঁর "ছত্রপতি শিবাজী", "সিরাজউদ্দৌলা", "মিরকাসিম" প্রভৃতি নাটকগুলির দান কোন্ জাতীয়তাবাদী অস্বীকার করবেন ?

আট

এতোদিন গিরিশচন্দ্র অসামান্য অভিনেতা ও জনপ্রিয় গীতিকার ও কবি হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষকে" নাটকাকারে রূপ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাকে নাটক রচনা বলা যায় না। মৌলিক নাটক রচনার দিকে এবার গিরিশচন্দ্র ভয়ে ভয়ে পা দিলেন। ভুবনমোহন নিয়োগীর টাকায় গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার চলছিল। কিন্তু ভুবনবাবু শীঘ্রই ঋণজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ায় তিনি থিয়েটার চালাতে অসমর্থ হলেন। তখন গিরিশচন্দ্রের পরিচালনাধীনে কয়েকজন লোক ভুবনমোহনের কাছ থেকে থিয়েটার লিজ নিয়ে তা চালাতে চেষ্টা করলেন। এই সময় গিরিশচন্দ্র তাঁর প্রথম গীতিনাট্য "আগমনী" ও "অকালবোধন" রচনা করেন। দীনবন্ধু ও মাইকেলের নাটক এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ দর্শকের কাছে পুরাতন হয়ে গিয়েছিল। তাই গিরিশচন্দ্র এই সময় মাইকেলের বিখ্যাত কাব্য মেঘনাদবধকে নাটকাকারে রূপান্তরিত ক'রে দিলেন এবং নাটকে তিনি নিজে মেঘনাদ ও রামের ভূমিকায় একই সঙ্গে অভিনয় ক'রে দর্শকদের বিস্মিত ক'রে দিলেন। এর কয়েক সপ্তাহ বাদেই তিনি নবীন সেনের বিখ্যাত "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যকে নাটকে রূপান্তরিত করলেন এবং নিজে ক্লাইভের

ভূমিকায় নামলেন। গিরিশচন্দ্র নাট্যকার হিসাবে তখনও তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিতে না পারলেও অতুলনীয় অভিনয় নৈপুণ্যের জন্যে সকলের কাছে উচ্চ-প্রসংশিত হয়েছিলেন। তাঁর "মেঘনাদবধে" মেঘনাদ, "পলাশীর যুদ্ধে" ক্লাইভ এবং "মৃণালিনীতে" পশুপতির ভূমিকা দেখে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর "সাধারণী" কাগজে লিখেছিলেনঃ "কোন্ দেশের কোন্ গ্যারিকের কাছে আমাদের বঙ্গের গিরিশ অভিনয়-কলা প্রদর্শনে হীন!"

কিন্তু নাট্যকার হিসাবেও নিজের অসামান্য শক্তির পরিচয় দেওয়ার সুযোগ তাঁর শীঘ্রই এলো। যাঁরা থিয়েটার লিজ নিয়ে চালাচ্ছিলেন, তাঁরাও এখন হাল ছেড়ে ছিলেন। কিন্তু ন্যাশন্যাল থিয়েটারের হাল ধরবার জন্যে উপযুক্ত একজন লোক শীঘ্রই এসে জুটলেন। এঁর নাম প্রতাপচাঁদ জহুরী। ইনি ভুবনমোহন নিয়োগীর কাছ থেকে ন্যাশন্যাল থিয়েটারের স্বত্ব কিনে নিলেন এবং গিরিশচন্দ্রের উপরই দিলেন নাট্যশালা পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার। ঐ সময়ে গিরিশচন্দ্র পার্কার কোম্পানিতে হিসাবরক্ষকের কাজ করতেন। কিন্তু আফিসের কাজ ও রঙ্গালয় চালনা একই সঙ্গে করা সম্ভব ছিল না। তাই প্রতাপচাঁদ তাঁকে অধ্যক্ষতার জন্যে মাসিক এক শ টাকা দিতে চাইলেন। কথায় বলে, যার নেশা ও পেশা এক, সেই সবচেয়ে সুখী। গিরিশচন্দ্র তাই পার্কার কোম্পানির টাকা আনা পাইয়ের অঙ্কের হিসাব ছেড়ে নাট্য-

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারী হওয়াই শ্রেয় মনে করলেন। প্রতাপ জহুরীর ন্যাশন্যাল থিয়েটার চার বছরেরও কিছু কম স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু এই চার বছরে গিরিশচন্দ্র কি অভিনয়ে, কি নাট্য-পরিচালনায়, কি নাটক রচনায় সমান কৃতিত্ব দেখালেন। এই থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত থাকার সময়ে তিনি "মায়াতরু," "মোহিনী প্রতিমা," "সীতার বনবাস," "অভিমন্যুবধ," "লক্ষ্মণবর্জন," "আলাদিন," "আনন্দরহো," "রাবণবধ," "সীতার-বিবাহ," "ব্রজবিহার," "রামের বনবাস," "সীতাহরণ," "ভোট-মঙ্গল," "মলিন মালা" ও "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" রচনা করেন।

এইসব নাটকগুলির রচনায় তিনি এক ধরনের পদ্য ব্যবহার করেন, যা পরে "গৈরিশ ছন্দ" নামে পরিচিত হয়েছে। গৈরিশ ছন্দ আর কিছু নয়, অক্ষরের বন্ধনমুক্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দ। মাইকেল মধুসূদন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেছিলেন, তাতে প্রতি লাইনে নির্দিষ্ট অক্ষর থাকতো। পাঠের সময়ে প্রয়োজনীয় যতি বা বিরাম প্রায়ই লাইনের মাঝে পড়তো। কিন্তু তাতে আবৃত্তি করা সাধারণ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। তাই গিরিশচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দের অক্ষরের বাঁধন ভেঙে দিলেন। যেখানেই যতি পড়বে, সেখানেই লাইন শেষ করলেন। এই-সৃষ্টি হ'লো এক অপূর্ব ভাব-ব্যঞ্জনায় ভরা দ্রুত ছন্দ। গিরিশচন্দ্রের আগে এই ছন্দ ব্যবহৃত হ'লেও গিরিশবাবু তাঁর অজস্র রচনার মধ্য দিয়ে একে বঙ্গ-সাহিত্যে স্থায়ী ও

ব্যাপক আসন দিয়ে যান। তাই তাঁর নাম অনুসারে একে "গৈরিশ ছন্দ" বলা হয়। কিছুদিন আগে পর্যন্তও এই গৈরিশ ছন্দকেই নাট্যকাররা তাঁদের দৃশ্যকাব্যের বাহন হিসাবে ব্যবহার করতেন।

প্রতাপচাঁদ জহুরী নাট্যশালাকে খাঁটী ব্যবসায়ীর দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। থিয়েটারকে জনপ্রিয় ক'রে তুলতে গেলে যে তাতে ক্রমাগত টাকা ঢালা দরকার, তা তিনি বুঝতেন না। এ নিয়ে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মতান্তর ঘটতে লাগলো। এই অবস্থায় ১৮৮৩ সালের জুন মাসে গিরিশচন্দ্র ন্যাশন্যাল থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র এক-দিনের জন্যেও ব'সে রইলেন না। ঐ সময় শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত গুরুমুখ রায় বীডন স্ট্রীটে গিরিশচন্দ্রের সাহায্যে "স্টার" থিয়েটার খুললেন। ঐ বছরের জুন মাসেই গিরিশচন্দ্রের লেখা "দক্ষযজ্ঞ" নাটক দিয়ে স্টার থিয়েটারের উদ্‌বোধন হ'লো। পুনরায় দক্ষের ভূমিকার গিরিশচন্দ্র অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্য দেখালেন। কিন্তু গুরুমুখ রায় দীর্ঘকাল এই থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারলেন না। তখনকার দিনে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করা বা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত থাকা লোকনিন্দার ব্যাপার ছিল। কারণ, সাধারণ রঙ্গ-মঞ্চে স্ত্রী-চরিত্রগুলি অসচ্চরিত্র ব'লে পরিচিত মেয়েদের দিয়েই অভিনয় করানো হ'তো। আত্মীয়-স্বজনের নিন্দা ও গঞ্জনার ভয়ে গুরুমুখ রায় শীঘ্রই স্টার থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। তখন

গিরিশচন্দ্র অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, হরিপ্রসাদ বসু ও দাসুচরণ নিয়োগীকে স্টারের স্বত্বাধিকারী ক'রে স্টার চালাবার ব্যবস্থা করলেন। এখন থেকে "স্টার" থিয়েটার জোর চলতে লাগলো। গিরিশচন্দ্র দর্শকদের নিত্য-নতুন নাটক উপহার দিতে লাগলেন। গিরিশচন্দ্রের দ্রুত নাটক লেখার ক্ষমতাও সকলকে অবাক ক'রে দিলো। এখানে তিনি পর পর "ধ্রুবচরিত্র," "নলদময়ন্তী," "কমলে-কামিনী," "বৃষকেতু," "হীরার ফুল," "শ্রীবৎসচিন্তা,"চৈতন্যলীলা," "প্রহ্লাদ-চরিত্র," "নিমাই-সন্ন্যাস," "প্রভাস-যজ্ঞ," "বিল্বমঙ্গল," "বেল্লিক-বাজার" ও "রূপ-সনাতন" রচনা করেন। এখন তিনি নাট্য-শালার পরিচালনা ও নাটকরচনাতেই তন্ময় থাকেন।

নয়

১৮৮৪ সালের ২রা আগস্ট তারিখে গিরিশচন্দ্রের "চৈতন্যলীলা" স্টারে প্রথম অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকের অভিনয়কালে গিরিশচন্দ্রের জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যা তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ঘটনাটি হ'লো "চৈতন্যলীলা" দেখবার জন্যে স্টার থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন। এর আগে গিরিশচন্দ্র দুবার রামকৃষ্ণকে চাক্ষুষ দেখেছিলেন, একবার বসুপাড়ার বিখ্যাত এটর্নি দীননাথ বসুর বাড়িতে, আর একবার রামকান্ত বসু স্ট্রীটের বলরাম বসুর বাড়িতে। গিরিশচন্দ্র প্রথম জীবনে ঘোর নাস্তিক ছিলেন। কিন্তু বার বার প্রিয়জনের মৃত্যুর ফলে তাঁর মনে ভগবানের প্রতি ভক্তির ভাব দেখা দিচ্ছিল। কিন্তু এখনও তিনি সাধু-সন্ন্যাসীদের বুজরুক ব'লেই মনে করতেন। তাই প্রথম বারে রামকৃষ্ণকে দেখে তাঁর মনে অশ্রদ্ধা ও সংশয়েরই উদ্রেক হয়েছিল। তিনি ভাবছিলেন, দক্ষিণেশ্বরের এই লোকটার পেছনে দেশের যতো গুণী-মানীরা—বিশেষ ক'রে কেশব সেনের মতো একজন সুশিক্ষিত লোক কেনই বা এভাবে ফিরছেন। কিন্তু দ্বিতীয় বারে তাঁর মনে রামকৃষ্ণ সম্পর্কে কিছুটা দুর্বলতা দেখা দিল—এই মানুষটির প্রতি একটি সহজ শ্রদ্ধা যেন তাঁর মনে দানা বেঁধে উঠতে লাগলো।

এই সময়ে গিরিশচন্দ্র তাঁর "চৈতন্যলীলা" নাটকখানি লেখেন। "চৈতন্যলীলা" মঞ্চস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এর সুখ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। দেশের বহু ধর্মপ্রাণ হিন্দু এই নাটকখানি দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। একদিন সন্ধ্যায় চৈতন্যলীলার অভিনয় হচ্ছে স্টারে, গিরিশচন্দ্র নাট্যশালার আঙিনায় পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় গিরিশচন্দ্রের পরিচিত এক ব্যক্তি, মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এসে বললেন, 'রামকৃষ্ণদেব থিয়েটার দেখতে এসেছেন। তাঁকে বসতে দাও ভালো, নইলে টিকিট কিনব।"

গিরিশচন্দ্র বললেন, "তাঁর টিকিট লাগবে না, কিন্তু অন্যদের লাগবে।"

গিরিশচন্দ্রের মুখের কথা শেষ না হ'তেই রামকৃষ্ণ গাড়ি থেকে নেমে থিয়েটারের উঠোনে এসে ঢুকলেন এবং গিরিশ-বাবুর নমস্কার করবার আগেই তিনি নমস্কার করলেন। গিরিশচন্দ্র প্রতিনমস্কার করলেন। রামকৃষ্ণ আবার নমস্কার করলেন। তখন গিরিশচন্দ্র তাঁকে মনে মনে নমস্কার ক'রে তাঁকে উপরে নিয়ে গিয়ে একটি বক্সে বসতে দিলেন এবং পাখার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে নিজের শরীর ভালো না থাকায় বাড়ি চ'লে গেলেন। "চৈতন্যলীলার" অভিনয় দেখে রামকৃষ্ণ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পরে এই অভিনয় সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "নকলে আসলে এক হয়ে গেল রে।"

গিরিশচন্দ্র সেদিন রামকৃষ্ণকে থিয়েটারে বসিয়ে দিয়ে

বাড়ি চ'লে গেলেও তিনি অনুভব করলেন, যেন এই মানুষটি তাঁকে ক্রমাগত দুর্বোধ্য আকর্ষণে টানছেন। এর কয়েক দিন বাদে গিরিশচন্দ্র তাঁদের পাড়ার চৌমাথায় একটি রকে বসেছিলেন। দেখলেন, কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে যেন ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে রামকৃষ্ণ ধীরপদে সেই পথ দিয়ে আসছেন। কাছাকাছি এলে তাঁর দলের একটি ছেলে বললো, "এই গিরিশ ঘোষ।"

গিরিশ রামকৃষ্ণকে দেখেই নমস্কার করলেন, কিন্তু সেদিন রামকৃষ্ণ নমস্কার করলেন না, ধীরে ধীরে তাঁর সামনে দিয়ে চৌমাথার দক্ষিণ দিকের রাস্তায় চ'লে গেলেন। এতে গিরিশচন্দ্র অপমান বা বিরক্তি বোধ করলেন না। অনুভব করলেন, যেন কী এক অদৃশ্য সূত্রে এই মানুষটি তাঁকে পিছু পিছু টানছেন। গিরিশচন্দ্র কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে ব'সে রইলেন, এমন সময় সেই ছেলেটি এসে বললো: "ঠাকুর আপনাকে ডাকছেন।" কথাগুলি শোনামাত্রই গিরিশচন্দ্র সম্মোহিতের মতো ছেলেটির সঙ্গে রামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। বলরামবাবু অসুস্থ ছিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁর বৈঠকখানায় ঢুকলে বলরামবাবু রোগশয্যা থেকে উঠে তাঁকে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলেন। বলরামবাবুর সঙ্গে রামকৃষ্ণ দু-একটি কথা বললেন, তারপর "বাবু, আমি ভালো আছি, বাবু, আমি ভালো আছি" বলতে বলতে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। গিরিশচন্দ্রের কাছে এই ব্যাপার কিছুটা অভিনয়

ব'লেই মনে হ'লো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই রামকৃষ্ণের কয়েকটি কথা তাঁর কানে এলো—"না না, ঢং নয় গো, ঢং নয়।" গিরিশচন্দ্র লজ্জা পেলেন, কিন্তু বিস্মিত হলেন,—ইনি কি অন্তর্যামী! ইনি তাঁর মনের কথা বুঝলেন কেমন ক'রে? ঐদিন ধর্ম সম্পর্কে রামকৃষ্ণের সঙ্গে গিরশচন্দ্রের দু-একটি কথা হ'লো।

হিন্দুধর্মে বলে, গুরু না হ'লে ধর্মসাধন হয় না। গিরিশচন্দ্র সে সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। রামকৃষ্ণ বললেন, "গুরু কি জান? ঘটক হে ঘটক, জুটিয়ে দেয়।" তারপর বললেন, "তোমার ভাবনা কি, তোমার গুরু হয়ে গেছে।"

গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণকে গুরুত্বে বরণ করবার আগেই রামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রকে শিষ্যত্বে বরণ করলেন। রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণে গিরিশচন্দ্রের মনে যেটুকু বা সংশয় ও অনিশ্চয়তা ছিল তা মুহূর্তে দূর হ'লো। রামকৃষ্ণ বললেন, "আর একদিন থিয়েটার দেখাইও।"

গিরিশচন্দ্র বললেন, "যে আজ্ঞে, যেদিন ইচ্ছা করবেন।"

রামকৃষ্ণ হেসে বললেন, "কিছু নিও।"

গিরিশচন্দ্রও হেসে বললেন, "ভালো, আট আনা দেবেন।"

—"না হে, সে বড় র‍্যাজলা জায়গা।"

—"না, আপনি যেখানে বসেছিলেন, সেখানেই বসবেন।"

—"না, একটি টাকা নিও।"

—"যে আজ্ঞে।"

এর পর থেকে রামকৃষ্ণ যেন গিরিশচন্দ্রকে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধলেন। গিরিশচন্দ্র মাঝে মাঝে মদের নেশায় রামকৃষ্ণকে অপমানও ক'রে বসতেন, কিন্তু তারপরেই আবার অনুশোচনা ও গ্লানিতে দগ্ধ হতেন, দক্ষিণেশ্বরে ছুটতেন রামকৃষ্ণের পাশে, তাঁর পা জড়িয়ে কাঁদতেন। রামকৃষ্ণের শিষ্যরা অনেক সময় মদ্যপায়ী উচ্ছৃঙ্খল গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের গুরুদেবের এই হৃদ্যতা পছন্দ করতেন না, বিশেষ ক'রে গিরিশচন্দ্র যখন রামকৃষ্ণকে অপমান ক'রে বসতেন। কিন্তু তাতেও এই ক্ষমাসুন্দর মানুষটি বিচলিত হতেন না, বলতেন, "গিরিশ হ'লো ভৈরব।"

একবার গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি এখন কি করব?" মানে, নাট্যশালা ছেড়ে ধর্মসাধনায় মন দেব কিনা। তার উত্তরে রামকৃষ্ণ বললেন, "যা কচ্ছ, তাই কর। ওতে লোকশিক্ষা হয়।"

গিরিশচন্দ্র ছিলেন অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ, তাঁর সংযমহীন উদ্দাম হৃদয়বৃত্তি ধর্মসাধনার পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। রামকৃষ্ণ একবার তাঁকে বললেন ঃ "সকালে বিকালে তাঁর (ভগবানের) কথা স্মরণ ক'রো।"

উত্তরে কি বলবেন, বুঝতে না পেরে গিরিশচন্দ্র ইতস্তত করছেন দেখে রামকৃষ্ণ বললেন, "আচ্ছা, তা যদি না পারো, তবে শোবার আগে তাঁকে একবার স্মরণ ক'রে নিও।"

গিরিশচন্দ্র মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এই উচ্ছৃঙ্খল

জীবন, কখন খাই, কখন শুই কোনও ঠিক নেই, অনেক সময় খেতে শুতে হুঁস থাকে না, এই অবস্থায় যদি গুরুদেবকে বলি 'করব', তবে মিছে কথা বলা হবে, অথচ তাঁর আদেশ অমান্য করাও অসম্ভব। রামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, "তুই বলবি, তাও যদি না পারি ? আচ্ছা তা যদি না পারিস, তবে আমায় বকলমা দে। আমিই তোর হয়ে করব।"

রামকৃষ্ণের কথা শুনে গিরিশচন্দ্র আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি তখনও বোঝেন নি যে, রামকৃষ্ণ তাঁকে কি কঠোর কর্তব্য পালনের ভার দিচ্ছেন। একদিন কি কাজের কথা বলতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র ব'লে উঠলেন, "আমি করব।"

অমনি রামকৃষ্ণ তাঁকে সংশোধন ক'রে দিয়ে বললেন, "ও কি গো ? অমন ক'রে 'আমি করব' বল কেন ? তুমি 'বকল্‌মা' দিয়েছ না ? যদি করতে না পার ? বলবে, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তো করব।"

এইভাবে রামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবনে ওলট-পালট ঘটিয়ে দিলেন। মাত্র দুটি বছরের ব্যাপার। ১৮৮৪ সালের আগস্ট মাসে চৈতন্যলীলার অভিনয়কালে তাঁদের পরস্পরের পরিচয় হয়েছিল; ১৮৮৬ সালের আগস্ট মাসে রামকৃষ্ণের মৃত্যু হ'লো। কিন্তু এই দুটি বছরেই রামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবনে যে আমূল পরিবর্তন

ঘটিয়ে দিয়ে গেলেন, তা নাট্যকার হিসাবেও গিরিশচন্দ্রকে অবশিষ্ট জীবন বিশেষভাবে প্রভাবিত করলো। আজ বাংলার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা রামকৃষ্ণকেই নাট্যশালার অধিষ্ঠাতা দেবতা মনে করেন, আজও প্রায় প্রতিটি সাধারণ রঙ্গশালায় রামকৃষ্ণের ছবি ঝুলতে দেখা যায়। রঙ্গালয়ে রামকৃষ্ণের এই সুদূরপ্রসারী প্রভাব এই দুটি বছরেই ঘটেছিল।

দশ

রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পরের বছর স্টার থিয়েটারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে এমারেল্ড থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হ'লো। এমারেল্ড থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা গোপাললাল শীল ছিলেন ধনী যুবক। তিনি গিরিশচন্দ্রকে বিশ হাজার টাকা বোনাস এবং মাসিক সাড়ে তিন শ টাকা মাইনেতে এমারেল্ড থিয়েটারে যোগ দেওয়ার জন্যে আহ্বান করলেন। গিরিশচন্দ্র কেবল অর্থলোভে স্টার থিয়েটার ছেড়ে যেতে চাইলেন না। তখন গোপাললাল নানাভাবে স্টার থিয়েটারের ক্ষতি করবেন এমন ভয় দেখাতে লাগলেন। দুটি থিয়েটারের এই রকম বিরোধের ফলে বঙ্গীয় নাট্যশালা বা নাট্যসাহিত্যের যে উন্নতি হবে না, সেকথা গিরিশচন্দ্র ভালোভাবেই জানতেন। তাই তিনি স্টারের কর্তৃপক্ষকে বোঝালেন যে, বোনাসের ঐ টাকা এককালীন পেলে তিনি তা স্টার থিয়েটারের নূতন বাড়ি তৈরির জন্যে দিতে পারবেন। তাতে স্টার থিয়েটারের উপকার হবে। স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষও এতে রাজী হয়ে গেলেন। ফলে গিরিশচন্দ্র বিশ হাজার টাকা বোনাসে ও মাসিক সাড়ে তিন শ টাকা মাইনেয় এমারেল্ড থিয়েটারে যোগ দিলেন।

গিরিশচন্দ্র এমারেল্ডের জন্যে "পূর্ণচন্দ্র" নামে একখানি নাটক লিখে দিলেন। নাটকখানির অভিনয় দেখে তখনকার

দিনের অন্যতম বিখ্যাত সাংবাদিক শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "এক 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকেই গোপালবাবুর বিশ হাজার টাকা আদায় হয়ে গেছে।"

ইতিমধ্যে হাতিবাগানে স্টার থিয়েটারের নূতন বাড়িটি তৈরী হয়ে গেল। গিরিশচন্দ্র গোপনে এই থিয়েটারের জন্যে "নসীরাম" নামে একখানি নাটক লিখে দিলেন। এই "নসীরাম" দিয়েই অমৃতলাল বসুর অধ্যক্ষতায় স্টার থিয়েটার খোলা হ'লো। এদিকে গিরিশচন্দ্র এমারেল্ড থিয়েটারের জন্যে "বিষাদ" নামে একখানি নাটক লিখে দিলেন। বিষাদের অভিনয় থেকেও স্টার থিয়েটার প্রচুর টাকা পেলো। কিন্তু ইতিমধ্যেই গোপাললাল শীলের থিয়েটারের শখ মিটে গেল, তিনি থিয়েটার লীজ দিলেন। গিরিশচন্দ্রও আবার স্টার থিয়েটারে ফিরে গেলেন। স্টার থিয়েটারে ফিরে এসে গিরিশচন্দ্র একে একে "প্রফুল্ল," "হারানিধি," "চণ্ড," "মলিনাবিকাশ" ও "মহাপূজা" নামে কতকগুলি নাটক লিখে দিলেন। গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র সুরেন্দ্রনাথ (দানীবাবু) তখন তরুণ যুবক। তিনিও এসে স্টার থিয়েটারে যোগ দিলেন। তিনি "চণ্ড" নাটকে রঘুদেবের ভূমিকায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তখন স্টার থিয়েটারের বড় সুদিন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনে আবার দুর্দিনের ঘনঘটা দেখা দিলো।

অল্পদিনের মধ্যে তাঁর দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাতা দুই কন্যার

মৃত্যু হ'ল। এক শিশু পুত্রের জন্ম দিয়ে তাদের জননীও সেই যে শয্যাশায়ী হলেন, আর উঠলেন না। মাতৃহীন শিশু পুত্রটিও রুগ্নদেহে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগলো। সাংসারিক এই অবস্থায় গিরিশচন্দ্র অধীর হয়ে পড়লেন। কেবল তাই নয়, নিজেও কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। এইভাবে এই সময় কিছুদিন রঙ্গালয়ের কাজে তিনি ঠিকমতো মনোনিবেশ করতে পারলেন না। এ নিয়ে স্টারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মনান্তর ঘটলো। যাই হ'ক, তাঁর শরীর একটু সুস্থ হ'লে তিনি রুগ্ন শিশু পুত্রটি নিয়ে বায়ু পরিবর্তনের জন্যে মধুপুরে গেলেন। কিন্তু সেখানে খবর পৌঁছলো যে, স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাঁর নামে মামলার জন্যে তৈরী হচ্ছেন। খবর পেয়েই গিরিশচন্দ্র কলকাতায় ফিরে এলেন। এর অল্পকাল বাদেই তাঁর শিশু পুত্রটি মারা গেল। কিন্তু এই কন্যাশোক, পত্নীশোক, পুত্রশোক, সবই একে একে গিরিশচন্দ্র সয়ে উঠতে পারলেন।

এই সময় বিখ্যাত জমিদার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্রের পরিচালনায় একটি থিয়েটার খুলতে চাইলেন। আগে যেখানে ন্যাশন্যাল থিয়েটার ছিল, সেখানেই সেই জমির ওপর নূতন থিয়েটার তৈরী হ'লো। এই থিয়েটারের নাম রাখা হ'লো "মিনার্ভা"। মিনার্ভার উদ্‌বোধন হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। এট্‌কিনসন সাহেবের অফিসে চাকরি করবার সময়ে

গিরিশচন্দ্র শেক্‌স্‌পীয়রের "ম্যাক্‌বেথ" নাটকখানিকে বাংলায় অনুবাদ করতে শুরু করেছিলেন। এখন সেই অনুবাদ শেষ ক'রে তিনি মিনার্ভার জন্যে তৈরী ক'রে দিলেন। দীর্ঘদিন তিনি অভিনয় করেননি, এই নাটকে তিনি নিজে ম্যাক্‌বেথের ভূমিকায় নামলেন। নাটকের জন্যে দৃশ্যসজ্জা করলেন চিত্রকর উইলার্ড সাহেব, প্রসাধন ইত্যাদির ভার নিলেন কিস সাহেব। ম্যাক্‌বেথের অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র ইংরেজ দর্শকদেরও বিস্মিত ক'রে দিলেন। "ইংলিশম্যান" কাগজের সম্পাদক এ-কে যে-কোনও ইংরেজ অভিনেতা ও ইংল্যাণ্ডের নাট্যশালার সমকক্ষ ব'লে ঘোষণা করলেন। "ম্যাক্‌বেথ" নাটকে গিরিশচন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ (দানীবাবু) ম্যাল্‌কমের ভূমিকায় নেমেছিলেন। লেডী ম্যাক্‌বেথের অভিনয় করেছিলেন শ্রীমতী তিনকড়ি। এই অশিক্ষিতা মেয়েটি যে গিরিশচন্দ্রের শিক্ষা-দানের গুণে এই কঠিন চরিত্রটিকে এইভাবে জীবন্ত ক'রে তুলতে পারবেন, তা কেউ না দেখে বিশ্বাস করতে পারেননি। কিন্তু সাধারণ দর্শকের কাছে বিদেশী নাটকের অনুবাদ খুব জনপ্রিয় হ'লো না। তাই দশ রাত্রি অভিনয়ের পর ম্যাক্‌বেথ বন্ধ ক'রে দিতে হ'লো।

এর পর গিরিশচন্দ্র মিনার্ভার জন্যে একে একে "মুকুল-মঞ্জুরা," "আবুহোসেন," "সপ্তমীতে বিসর্জন," "জনা," "বড়দিনের বকশিস," "স্বপ্নের ফুল," "সভ্যতার পাণ্ডা," "করমেতিবাই," "ফণীর মণি" ও "পাঁচ কনে" লিখে দেন।

"জনা" গিরিশচন্দ্রের অন্যতম বিখ্যাত নাটক। এই নাটকে জনার পুত্র প্রবীরের ভূমিকায় দানীবাবু অভিনয় করেন। অভিনেতা হিসাবে তিনি যে ভবিষ্যতে পিতার উপযুক্ত পুত্র ব'লে পরিচিত হবেন, সে-বিষয়ে কোনও সংশয় থাকে না। তিনি "মুকুলমঞ্জুরা," "বড়দিনের বকশিস্," "স্বপ্নের ফুল," "করমেতিবাই" প্রভৃতি নাটকগুলিতেও অভিনয় করেন। এই সব নাটকের অভিনয় থেকে মিনার্ভা প্রচুর টাকা পায়। কিন্তু স্বত্বাধিকারী নগেন্দ্রভূষণ নিজের দোষে ক্রমেই ঋণ-জালে জড়িয়ে পড়েন। এ নিয়ে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মনান্তর ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভার সংস্রব ত্যাগ করেন (১৮৯৬)।

গিরিশচন্দ্রের মিনার্ভা ত্যাগের সংবাদ পেয়েই স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাঁকে আবার স্টার থিয়েটারে নিয়ে যান। গিরিশচন্দ্রের নূতন নাটক "কালপাহাড়" স্টারে অভিনীত হ'লো। গিরিশচন্দ্র নিজে নামলেন চিন্তামণির ভূমিকায়। আর ছেলে সুরেন্দ্রনাথ (দানীবাবু) নামলেন নাম ভূমিকায়। এই সময় গিরিশচন্দ্র স্টারের জন্যে "হীরক জুবিলি," "পারস্য-প্রসূন" ও "মায়াবসান" নাটকগুলিও লিখে দেন। "মায়া-বসানে" তিনি নিজে কালীকিঙ্করের ভূমিকায় নামেন। হলধরের ভূমিকায় নামেন দানীবাবু।

১৮৯৭ সালে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এমারেল্ড থিয়েটারের বাড়ি ভাড়া নিয়ে ক্লাসিক থিয়েটার স্থাপন করেন। কিছুদিন

বাদে নাট্যাচার্যরূপে গিরিশচন্দ্রও ক্লাসিকে যোগ দেন। এই সময়ে তিনি "দেলদার" ও "পাণ্ডবগৌরব" রচনা করেন। "পাণ্ডবগৌরব" নাটকে গিরিশচন্দ্র নিজে কঞ্চুকীর ভূমিকায় নামেন। "দেলদার" নাটকে দানীবাবু নামেন সরলের ভূমিকায়।

১৯০০ সালে নরেন্দ্রনাথ সরকার মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী হন। তখন তিনি গিরিশচন্দ্রকে ক্লাসিক থেকে নিয়ে গিয়ে মিনার্ভার ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। এই সময়েই গিরিশচন্দ্রের জীবনে পুনরায় সন্তান-বিয়োগ ঘটে। তিনি যখন প্রথমে স্টারে যোগ দিয়েছিলেন, তখন তাঁর বড় মেয়ের বিবাহ হয়েছিল। সেই মেয়েটি এখন স্বামী ও ছেলেকে রেখে মারা গেলেন।

পত্নী ও পুত্র-কন্যার মৃত্যু গিরিশচন্দ্রের জীবনে বারে বারে ঘটেছে। বুক তাঁর পাষাণ হয়ে গেছে। এবারেও তিনি এই শোক কাটিয়ে উঠে বাণীর আরাধনায়,মন দিলেন। তিনি মিনার্ভায় যোগ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের "সীতারাম" উপন্যাসকে নাটকাকারে রূপায়িত করলেন। তিনি নিজে সীতারামের ভূমিকায় নামলেন; গঙ্গারামের ভূমিকায় নামেন দানীবাবু। সীতারামের পর গিরিশচন্দ্র "মণিহরণ" ও "নন্দদুলাল" রচনা করেন। নন্দদুলালে আয়ানের ভূমিকায় দানীবাবু অভিনয় করেন। এই সময়ে গিরিশচন্দ্রের ভাই অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ছ'খণ্ডে "গিরিশ গ্রন্থাবলী" প্রকাশ করেন। এতে

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কতকগুলি নাটকও প্রথম প্রকাশিত হয়।

যাই হ'ক, মিনার্ভা থিয়েটারে আশানুরূপ অর্থাগম না হওয়ায় নগেন্দ্রনাথ সরকার থিয়েটার বন্ধ ক'রে দিলেন। তখন অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে আবার ক্লাসিকে নিয়ে গেলেন। এখানে গিরিশন্দ্র "অশ্রুধারা", "মনের মতন", "অভিশাপ", "শান্তি", "ভ্রান্তি", "আয়না" ও "সৎনাম" রচনা করেন। "ভ্রান্তি" নাটকে রঙ্গলালের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র ও পুরঞ্জনের ভূমিকায় দানীবাবু অভিনয় করেন। "আরাধনা" নাটকে গিরিশচন্দ্র তিন-চার রাত্রি সৃষ্টিধরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। "সৎনাম" নাটকে আওরঙ্গজেবের ভূমিকায় অভিনয় করেন দানীবাবু। কিন্তু ক্লাসিকেও শীঘ্রই গোলযোগ দেখা দেয়। তখন গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক ছেড়ে চ'লে যান।

শীঘ্রই মনোমোহন পাঁড়ে ও মহেন্দ্রনাথ মিত্র ষাট হাজার টাকা দিয়ে মিনার্ভার স্বত্ব কিনে মিনার্ভার পরিচালনা ভার গিরিশচন্দ্রের উপর দেন। গিরিশচন্দ্রের বয়স তখন প্রায় ষাট। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সেও গিরিশচন্দ্র মিনার্ভার কার্যভার গ্রহণ ক'রে যে কৃতিত্ব দেখান, তার তুলনা মেলে না। এই সময় তিনি কতকগুলি শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা করেন এবং ঐ সকল নাটকের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই সময় তিনি "হরগৌরী," "বলিদান," "সিরাজউদ্দৌলা," "বাসর," "মিরকাশিম," "য্যায়সা কা ত্যায়সা" ও "ছত্রপতি শিবাজী"

রচনা করেন। "বলিদান" নাটকে তিনি তৎকালীন সমাজের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার এক মর্মান্তিক রূপ উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেখান। করুণাময়ের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র নিজে অভিনয় করেন এবং দুলালের ভূমিকায় অভিনয় করেন দানীবাবু। বলিদানের পরে "সিরাজউদ্দৌলা" নাটকখানি পুনরায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। সিরাজের অভিনয় করেন দানীবাবু, করিমচাচার অভিনয় করেন গিরিশচন্দ্র এবং দানসার অভিনয় করেন নট-চূড়ামণি-অর্ধেন্দুশেখর। এই নাটকে গিরিশচন্দ্র বহু-নিন্দিত সিরাজকে এক অপরূপ রূপে বাঙ্গালীর চোখের সামনে তুলে ধরেন। অথচ তার মধ্যে কল্পনার ভেজাল ছিল না, তা ছিল প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য। ইংরেজ লেখকদের লেখা ইতিহাস প'ড়ে আমরা সিরাজের প্রকৃত চরিত্রকে ভুলতে বসেছিলাম। গিরিশচন্দ্র তাকে পুনরায় সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করলেন। এই নাটকখানি রচনার জন্যে তিনি গোলাম-হোসেন-রচিত সায়র-উল-মুতাক্ষরিন, রেয়াজ সউল, সালেতিন, অর্মির হিন্দুস্থান, হলওয়েল সাহেবের স্বরচিত বিবরণ, বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত ওয়ারেন হেস্টিংসের পাণ্ডুলিপিসমূহ, ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সনের লেখা চিঠিপত্র, কোম্পানির পরিচালক-সভার কাছে পাঠানো তথ্যাদি, ক্রাফ্‌টন ইভ্‌স্‌ জার্নাল, মিলের হিস্ট্রি অব বৃটিশ ইণ্ডিয়া, হাণ্টারের স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউণ্টস্‌ অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি বহু চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ও বই পড়েন। জাতীয়তাবাদে উদ্‌বুদ্ধ বাঙ্গালীর কাছে

সেদিন এই নাটকখানি এক নূতন আলো এনে দেয়। বস্তুত গিরিশচন্দ্রই সিরাজউদ্দৌলাকে বাঙ্গালীর কাছে জনপ্রিয় ও জাতীয়তার মূর্ত-প্রতীকরূপে স্থাপিত করেন।

এর তিন মাস বাদে মিনার্ভায় তাঁর "বাসর" নাটকখানি অভিনীত হয়! বিক্রমাদিত্যের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র এবং জগন্নাথের ভূমিকায় দানীবাবু ও বিধাতাপুরুষের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর অভিনয় করেন। ১৯০৬ সালের জানুয়ারি মাসে গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসখানিকে নূতন ক'রে নাটকাকারে পরিবর্তিত ক'রে দেন। তিনি নিজে বীরেন্দ্র সিংহের ভূমিকায় নামেন। বিদ্যাদিগ্‌গজ করেন অর্ধেন্দুশেখর ও ওসমান করেন সুরেন্দ্রনাথ (দানীবাবু)।

এর মাস পাঁচেক বাদেই, জুন মাসে, গিরিশচন্দ্রের অন্যতম বিখ্যাত নাটক "মিরকাশিম" মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকখানিও "সিরাজউদ্দৌলার" মতোই জাতীয়তাবাদে উদ্‌বুদ্ধ ছিল। মিরজাফরের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র ও মিরকাশিমের ভূমিকায় দানীবাবু অভিনয় করেন। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে গিরিশচন্দ্রের "য্যায়সা কা ত্যায়সা' মঞ্চস্থ হয়।

পরের বছর (১৯০৭) মিনার্ভায় তাঁর "ছত্রপতি শিবাজী" মঞ্চস্থ হয়। "সিরাজউদ্দৌলা" ও "মিরকাশিম" নাটকের মতোই "ছত্রপতি শিবাজী" নাটককেও গিরিশচন্দ্র ইতিহাসসম্মত ভাবে রচনা করেন। কিছুদিন আগে ভারতের সুমহান্ নেতা লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রে

শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন। জাতীয়তাবাদে উদ্‌বুদ্ধ ঐ উৎসবের ঢেউ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই শিবাজী-উৎসবের উদ্দেশেই কবি রবীন্দ্রনাথ ঐ সময় তাঁর বিখ্যাত কবিতা "শিবাজী-উৎসব" লিখেছিলেন। ১৯০৬ সালে শিবাজী-উৎসব ও লোকমান্য তিলকের বাংলা-দেশে আগমন গিরিশচন্দ্রকে যে "ছত্রপতি শিবাজী" রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

"সিরাজউদ্দৌলা," "মিরকাশিম" ও "ছত্রপতি শিবাজী" বাঙ্গালীর জাতীয় জাগরণে যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিল, তা একটি ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায়। এই নাটকগুলি মঞ্চস্থ হওয়ার কয়েক বছর বাদে এগুলির প্রভাব সম্পর্কে ইংরেজ সরকার অত্যন্ত ভীত হয়ে ওঠেন এবং ১৯১১ সালে ঐ নাটকগুলির অভিনয় ও প্রকাশ নিষিদ্ধ ক'রে দেন। এই সেদিন পর্যন্তও এই নাটকগুলি বেআইনী ছিল। ন্যাশন্যাল থিয়েটারে (জাতীয় রঙ্গালয়) যাঁর অভিনয় জগতে প্রথম পদার্পণ ঘটেছিল, তাঁর নাট্যপ্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ যে ঐ জাতীয়তাবাদী নাটকগুলিতেই হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি! "সিরাজউদ্দৌলা" ও "মিরকাশিম" নাটকে বাঙ্গালী জাতি তার বিস্মৃত ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ফিরে পেয়েছিল। এগুলির অসামান্য জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ। কেবল "সিরাজউদ্দৌলা" ও "মিরকাশিম" নাটকের অভিনয় থেকেই মিনার্ভা থিয়েটার লক্ষাধিক টাকা পেয়েছিল।

এগারো

কিন্তু শীঘ্রই (১৯০৭) মিনার্ভার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের সম্পর্ক আবার ছিন্ন হ'লো। ঐ সময় হাইকোর্টের উকিল প্রসন্নকুমার রায়ের পুত্র শরৎকুমার রায় এক লাখ আট হাজার টাকা দিয়ে এমারেল্ড থিয়েটার (ক্লাসিক) কিনে নিলেন। এখন এই থিয়েটারের নূতন নাম হ'লো "কোহিনুর"। শরৎকুমার গিরিশচন্দ্রকে দশ হাজার টাকা বোনাস ও মাসিক চার শ টাকা মাইনে দিয়ে "কোহিনুর" থিয়েটারের ম্যানেজার নিযুক্ত করলেন। এই সময়ে গিরিশচন্দ্রের বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর। বয়স ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছিল। তাঁর দানবের মতো শক্তিও যেন ক্রমেই ফুরিয়ে আসছিল। তিনি দুরন্ত হাঁপানিতে ভুগছিলেন। পান ও তামাক চিরদিন তাঁর প্রিয় সহচর ছিল। তিনি অবিলম্বে ঐ দুটি জিনিস ছেড়ে দিলেন। কিন্তু রোগ ক্রমেই বেড়ে চললো। তাই "কোহিনুর" থিয়েটারের জন্যে তিনি কোনও নূতন নাটক লিখলেন না। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "চাঁদবিবি" দিয়েই "কোহিনুর" রঙ্গালয়ের উদ্‌বোধন হ'লো।

কিন্তু উদ্‌বোধনের এক বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠাতা শরৎকুমার মারা গেলেন। তখন শরৎকুমারের ছোট ভাই

শিশিরকুমার রায় থিয়েটার চালাবার ভার নিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে উপযুক্ত সদ্‌ব্যবহার করলেন না। ফলে তাঁদের দু'জনের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটলো। শিশিরকুমার গিরিশচন্দ্রের বেতন বন্ধ ক'রে দিলেন। গিরিশচন্দ্রকে বাধ্য হয়ে আইনের আশ্রয় নিতে হ'লো। মামলায় গিরিশচন্দ্রই জয়ী হলেন। আদালত তাঁর বোনাসের জন্যে দেয় বাকী চার শ টাকা ও বাকী বেতন মিটিয়ে দেওয়ার জন্যে হুকুম দিলেন। গিরিশচন্দ্র আবার মিনার্ভায় ফিরে গেলেন।

গিরিশচন্দ্রকে অভিনেতা জীবনে বহুবার রঙ্গালয় বদল করতে হয়েছিল। তার প্রধান কারণ ছিল এই যে, গিরিশচন্দ্র অভিনেতা, নাট্যকার, শিক্ষাদাতা ও পরিচালক হিসাবে প্রত্যেক রঙ্গালয়ের কাছে অতীব লোভনীয় ছিলেন। তাই সকল রঙ্গালয়ই তাঁকে পাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হ'তো। অন্যপক্ষে তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা ও প্রাধান্য রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে শীঘ্রই দুঃসহ হয়ে উঠতো। ফলে রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গিরিশের মনান্তর ছিল অনিবার্য। আর মনান্তর ঘটলেই গিরিশ সে থিয়েটার ছেড়ে অবিলম্বে অন্য থিয়েটারে চলে যেতেন—যাওয়ার মতো থিয়েটারের অভাব ছিল না তাঁর। এই মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চই তিনি তিনবার ছেড়েছিলেন। কিন্তু এইবার যে তিনি মিনার্ভায় এসে যোগ দিলেন, এই তাঁর রঙ্গালয়ে শেষ যোগ দেওয়া। কারণ

জীবনের শেষ দিন তাঁর ঘনিয়ে এসেছিল। আর মিনার্ভায় তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি যে কেটেছিল, সেটিও খুব সুখের ব্যাপার হয়েছিল। কারণ, মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চ যেখানে গ'ড়ে উঠেছিল, সেখানেই ছিল ন্যাশন্যাল থিয়েটারের স্থায়ী নাট্যশালার আদিভূমি। আটাশ বছর আগে এই নাট্যশালাকেই তিনি জীবনের একমাত্র কর্মস্থলরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র চতুর্থবার মিনার্ভায় যোগ দিয়ে "শাস্তি কি শান্তি", "শঙ্করাচার্য", "অশোক" ও "তপোবল" পর পর লিখেছিলেন। ১৯০৮ সালে তাঁর দীর্ঘদিনের প্রিয় সহচর অর্ধেন্দুশেখরের মৃত্যু হ'লো। গিরিশচন্দ্র লিখলেন তাঁর "নট-চূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর" নামে বিখ্যাত প্রবন্ধ। অভিনেতা হিসাবে অর্ধেন্দুশেখর তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হ'লেও তাঁকে যে তিনি কতোখানি ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন, তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এই প্রবন্ধটির ভেতর। ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে গিরিশচন্দ্রের "শাস্তি কি শান্তি" মঞ্চস্থ হ'লো। দানীবাবু প্রসন্নকুমারের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই নাটকখানিতে বিধবা বিবাহের সমস্যা নিয়ে গিরিশচন্দ্র আলোচনা করেন এবং সমাজের একটি করুণ দিক দর্শকদের সম্মুখে তুলে ধরেন।

গিরিশচন্দ্রের স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভেঙে পড়ায় তিনি স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য কিছুদিন কাশীতে গিয়ে থাকলেন। তাতে

তাঁর শরীরের কিছুটা উন্নতি হ'লো। ১৯১০ সালের জানুয়ারি মাসে "শঙ্করাচার্য" ও ডিসেম্বর মাসে "রাজা অশোক" মঞ্চস্থ হ'লো। দানীবাবু শঙ্কর ও অশোকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। পর বৎসর নভেম্বর মাসে মঞ্চস্থ হ'লো "তপোবল"। দানীবাবু বিশ্বামিত্রের ভূমিকায় নামলেন। অর্ধেন্দুশেখর পরলোকে, গিরিশচন্দ্র অভিনয় থেকে প্রায় অবসর নিয়েছেন। এখন দানীবাবুই যে বাংলা রঙ্গমঞ্চের যুবরাজ, সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। দ্বিজেন্দ্রলালের "সাজাহান" নাটকে ঔরংজেব ও "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকে চাণক্যের ভূমিকায় তিনি যে অদ্ভুত শিল্পকর্ম দেখালেন, তা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। পুত্রগর্বে গিরিশচন্দ্র সত্যই গর্বিত। অভিনয়ের ক্ষেত্রে তাঁর পুত্র যে তাঁর যোগ্যতম উত্তরাধিকারী, সে বিষয়ে তাঁর পরম শত্রুরও কোনও সন্দেহ রইলো না।

গিরিশচন্দ্র পর পর আরও তিনখানি নাটক লিখলেন। কাশী থেকে ফেরবার পর তাঁর মধ্যে আবার পরিপূর্ণ কার্যোত্তম দেখা দিয়েছিল। তা যে নির্বাণোন্মুখ দীপের শেষ আলোকোচ্ছ্বাস, তা কে জানতো! গিরিশচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই "নিত্যানন্দবিলাস", "বিধবা-বিবাহ" ও "চাবুক" রচনা করলেন। অন্য কতকগুলি নাটকের রচনাও আরম্ভ হ'লো। কিন্তু সেগুলির রচনা শেষ হবার আগেই মহাকালের ডাক এলো।

যে রঙ্গালয়ের জন্যে গিরিশচন্দ্র তাঁর জীবন-মন উৎসর্গ করেছিলেন, সেই রঙ্গালয়ই তাঁর মৃত্যুর আশু কারণ হ'লো। অনেকদিন গিরিশচন্দ্র অভিনয় করেননি। সম্ভবত তিনি রঙ্গনাথকে তাঁর শেষ প্রণাম জানাতে চাইলেন। ১৯১১ সালের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ তিনি "বলিদান" নাটকে অভিনয় করবেন ব'লে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'লো। "বলিদান" নাটকে করুণাময়ের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রকে দেখবার লোভ কোন্ নাট্যামোদী সামলাতে পারে? দর্শকদের ভিড়ে রঙ্গালয় পূর্ণ হ'লো। কিন্তু আষাঢ়ের মেঘে আকাশ ছেয়ে গেলো। শুরু হ'লো ঘোর দুর্যোগ—নটরাজ মহারুদ্রই যেন সেদিন তাঁর পরম ভক্তকে গ্রহণের জন্যে এই জাল পাতলেন!

করুণাময়ের ভূমিকায় অনেক দৃশ্যে খালি গায়ে অভিনয় করতে হয়। গিরিশচন্দ্র আপাতত সুস্থ থাকলেও রোগ যে তাঁর শরীরে বাসা বেঁধে আছে, সেকথা স্মরণ ক'রে সকলে তাঁকে সে রাতে অভিনয় করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু নিষেধ গিরিশচন্দ্র শুনলেন না—রঙ্গনাথের ডাকই তাঁর কাছে বড় হ'লো। গিরিশচন্দ্র করুণাময়ের ভূমিকায় অভিনয় করলেন। সকলেই যা ভয় করেছিল, তাই হ'লো—তাঁর ঠাণ্ডা লাগলো। তিনি বাড়ি ফিরে সেই যে শয্যা নিলেন, আর উঠলেন না।

কয়েক মাস রোগ ভোগের পর এলো অন্তিম রাত্রি।

১৯১২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি রাত্রি ১টা ২০ মিনিটে তাঁর মহাজীবন-নাট্যের অবসান হ'লো।

গিরিশচন্দ্র তাঁর জীবনে প্রায় ৮০ খানি নাটক লিখেছিলেন। তা পৃথিবীর আর কোনো নাট্যকারের ভাগ্যে ঘটেছিল ব'লে জানি না। শেক্স্পীয়র নাট্যকার ছিলেন, অভিনেতাও ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভা শেক্স্পীয়রের সমকক্ষ হয়তো ছিল না, কিন্তু অভিনেতা হিসাবে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে শেক্স্পীয়রের তুলনাই হয় না। নাট্যশিল্পে গিরিশচন্দ্র ছিলেন সব্যসাচী—তিনি তাঁর কালে বাংলার রঙ্গজগতে কি নাট্যরচনায়, কি নাট্যাভিনয়ে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট। তেমনটি পৃথিবীর আব কোনও নাট্যশিল্পীর ভাগ্যে ঘটেনি। সেদিক থেকে তিনি ছিলেন অতুলনীয়, অদ্বিতীয়।

বাংলার নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্য গিরিশচন্দ্রের কাছে চিরঋণী হয়ে আছে। বাঙ্গালী জাতির এই ঋণ অপরিশোধ্য।

॥ ওরিয়েণ্টের ছোটদের জীবনী ॥

ঋষি দাসের লেখা

লোকমান্য তিলক	...	১৷০
ছোটদের নজরুল	...	১৷০
আবুল কালাম আজাদ	...	২৲

চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতীর লেখা

মহাকবি মাইকেল	...	১৲
কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র	...	১৲
মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগর	...	১৲
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র	...	১৲

প্রভাত বসুর

জওহরলালের গল্প	...	১৷০

সুকুমার রায়ের

সীমান্ত গান্ধী	...	১৷০

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

ছোটদের শরৎচন্দ্র	...	৸০
ছোটদের বিদ্যাসাগর	...	৷৶০

॥ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি ॥
॥ কলিকাতা-১২ ॥